কুমিল্লায় মুঘল যুগের স্থাপত্য

এম ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মার্চ ২০০৩

Dhaka University Library
400861

400861

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

প্রণেতা :
মাহ্‌মুদা খানম
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৫১২
সেশন : ১৯৯৭-৯৮ (পুনঃ)
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ণ পত্র

প্রত্যয়ণ করা যাচ্ছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এম ফিল গবেষক **মাহ্‌মুদা খানম**-এর *কুমিল্লায় মুঘল যুগের স্থাপত্য* শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি মাহ্‌মুদা খানমের নিজস্ব ও মৌলিক রচনা, অন্য কোন গবেষকের রচনার হুবহু অনুকৃতি নয়। আমি এই অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত অনুলিপি পূর্বাপর পাঠ করেছি, এবং এম ফিল অভিসন্দর্ভ হিসেবে জমাদানের উপযুক্ত বিবেচনা করে তা জমা দেওয়ার অনুমতি প্রদান করেছি।

১০/১১/০৫

(পারভীন হাসান)
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

400861

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

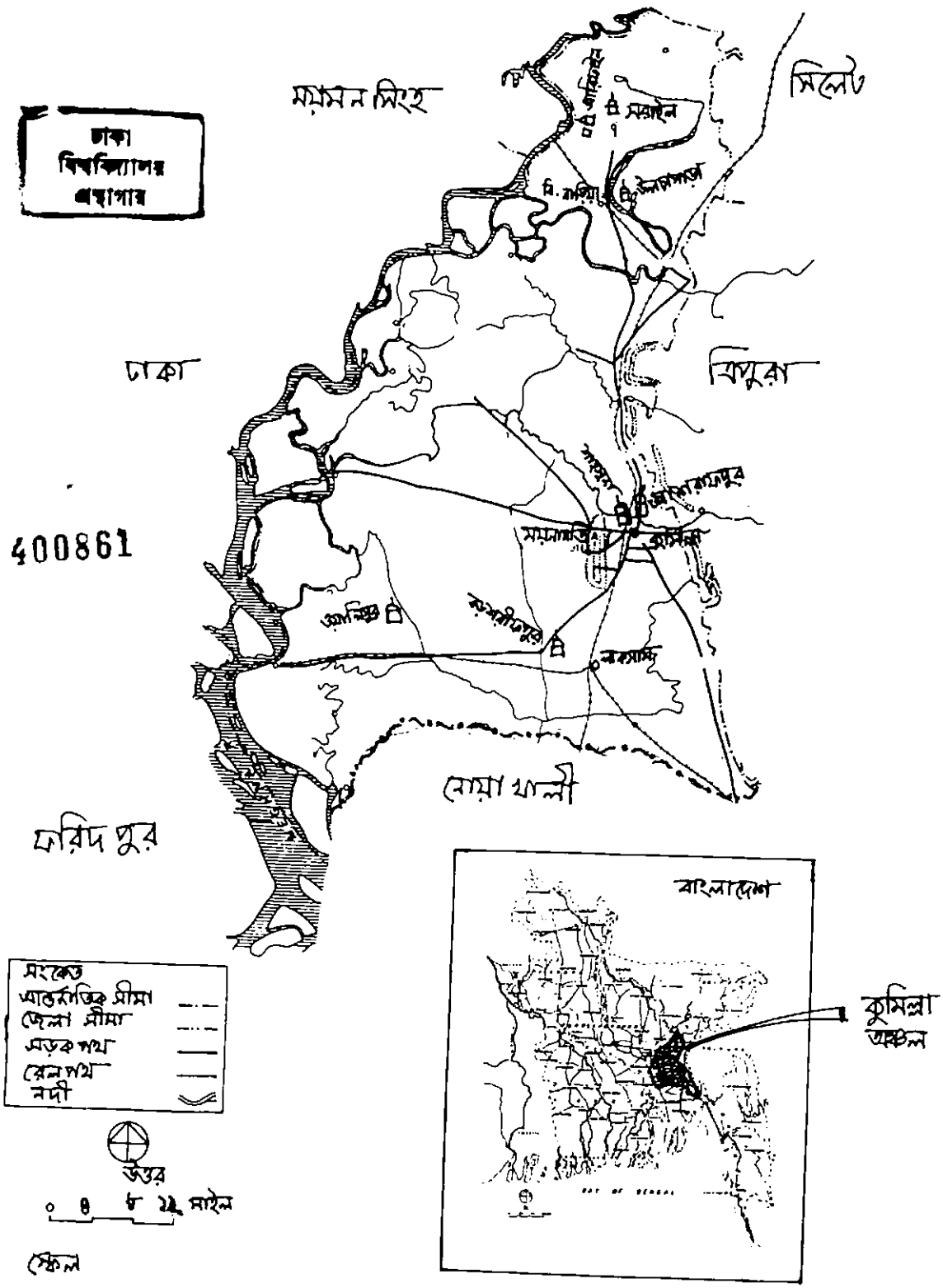

400861

কুমিল্লার মুঘল স্থাপত্য

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে এমএ শেষবর্ষের ছাত্রী থাকাকালে প্রথম মধ্যযুগের বাংলার স্থাপত্য নিয়ে আমার আগ্রহ জন্মায়। তখনই পরিকল্পনা করি ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে এ বিষয়ে আরো বেশি জানার চেষ্টা করবো। সেই পরিকল্পনারই ফসল *কুমিল্লায় মুঘল যুগের স্থাপত্য* শীর্ষক এই গবেষণা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ আমাকে এই গবেষণার সুযোগ দিয়েছে বলে প্রথমেই বিভাগের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই গবেষণা কর্মটি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ও আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর পারভীন হাসানের সযত্ন দিক নির্দেশনা এবং পরামর্শের কারণেই। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ থেকে শুরু করে তার বিশ্লেষণ পর্যন্ত গবেষণার প্রতিটি স্তরেই তিনি আমাকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, এই অভিসন্দর্ভের প্রতিটি পৃষ্ঠা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করেছেন এমনকি প্রয়োজনীয় বই-পত্র কোথায় পেতে পারি তাও জানিয়ে দিয়েছেন। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর হাবিবা খাতুন, প্রফেসর নাজমা খান মজলিশ (নাজমা বেগম), প্রফেসর আয়শা বেগম, ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, ড. মো. আখতারুজ্জামান ও জনাব মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানও বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর আব্দুল মমিন চৌধুরী এবং বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ড. এনামুল হকও বিভিন্ন পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন, সে সঙ্গে বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

এশিয়াটিক সোসাইটির বাংলাপিডিয়া প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্যসূত্র এবং বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে দিয়ে তারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনারের আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার ও এম আর তরফদার স্মৃতি জাদুঘরের সংগ্রহশালা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের কর্মচারিদের মধ্যে বিশেষ করে কবির আহমেদ ও ছরোয়ার আহমেদ সব সময় এ ব্যাপারে আমাকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা দিয়েছেন। এছাড়া শিল্পকলা একাডেমী গ্রন্থাগার, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্রন্থাগার, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ (আই বি এস) গ্রন্থাগার এবং বালাদেশ জাতীয় আর্কাইভস গ্রন্থাগার থেকেও সহায়তা নিয়েছি।

ব্যক্তিগতভাবে যাদের সহযোগিতা আমার গবেষণার পথকে সুগম করেছে তাদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ড. শামীম বানু, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক জনাব মুহাম্মদ আবদুল কাদির, আমার শ্রদ্ধেয় বড়ভাই জাকারিয়া মুক্তা, বন্ধু মাসুদ রানা খান, নাজলী চৌধুরী, কানিজ ফাতেমা ছন্দা, ছোট বোন সুরাইয়া আক্তার এবং ছোট ভাই সানাউল হক দোলন ও মোস্তাফিজুর রহমান নোমানী। মুক্তাভাই ও মাসুদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সব সময় আমাকে সাহচর্য দিয়েছেন, তাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া এই গবেষণা শেষ করা আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব হতো না। ড. শামীম বানু, জনাব আব্দুল কাদির ও নাজলী চৌধুরী কুমিল্লা অঞ্চলে আমার

Dhaka University Institutional Repository

খুঁজে পাওয়া শিলালিপিগুলোর পাঠোদ্ধার করে দিয়েছেন, দোলন তৈরি করে দিয়েছে এই অভিসন্দর্ভের সকল মানচিত্র ও ভূমিপরিকল্পনা আর নোমানী প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে তুলে দিয়েছে এই অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত বেশ ক'টি গুরুত্বপুর্ণ আলোকচিত্র। তাদের প্রতিও আমার ঋণ অসামান্য।

আরো একজনের কথা হয়তো বলা উচিৎ ছিলো - আমার প্রিয় বন্ধু খাদেমুল হক, নিজের শত ব্যস্ততার মধ্যেও রাতের পর রাত জেগে এই অভিসন্দর্ভ টাইপ করে দিয়েছে সে, যে কোন বিষয়ে কোন তথ্য নিয়ে সংশয় হলে সব সময় তার সহযোগিতা পেয়েছি, প্রয়োজনে নতুন করে বইপত্র ঘেঁটে নিজেই তার সমাধান করে দিয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এমন, তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো যায় না।

মাহ্‌মুদা খানম

মার্চ, ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	১-৩
ভূমিকা	৫-১০
প্রথম অধ্যায় :প্রেক্ষাপট	১১-৩৪
দ্বিতীয় অধ্যায় : কুমিল্লা অঞ্চলের মুঘল স্থাপত্যসমূহ	৩৬-৭০
ক) সরাইল মসজিদ	৩৬-৪০
খ) শাহ সুজা মসজিদ	৪১-৪৫
গ) ভাদুঘর মসজিদ	৪৬-৪৮
ঘ) আরিফাইল মসজিদ	৪৯-৫২
ঙ) আরিফাইলের সমাধি	৫৩-৫৬
চ) বড় শরীফপুর মসজিদ	৫৭-৫৯
ছ) উলচাপাড়া মসজিদ	৬০-৬৩
জ) আশরাফপুর সদরগাজি মসজিদ	৬৪-৬৬
ঝ) ওয়ালিপুর আলমগীরি মসজিদ	৬৭-৭০
তৃতীয় অধ্যায় : উপসংহার	৭১-৮২
পরিশিষ্ট-১ : ভূমি-পরিকল্পনা	৮৩-৯১
পরিশিষ্ট-২ : আলোকচিত্র	৯২-১২১
পরিশিষ্ট-৩ : কুমিল্লা অঞ্চলের মুঘল শিলালিপি	১২২-১২৭
পরিশিষ্ট-৪ : গ্রন্থপঞ্জি	১২৮-১৩১
পরিশিষ্ট-৫ : পরিভাষা	১৩২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র সমকালীন স্থাপত্য। কোন একটি অঞ্চলের স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসাধারণের রুচিবোধ, তাদের সংস্কৃতির পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি ঐ অঞ্চলের শাসক গোষ্ঠি এবং তাদের প্রশাসনের চরিত্র সম্পর্কেও খানিকটা ধারণা পাওয়া যায়। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে নগরায়ণের ধারা এবং তার সূত্র ধরে প্রশাসনের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতিও অনুভব করা যায়। আধুনিক ইতিহাস আর কেবল রাজ-রাজড়াদের কাহিনীই নয়, এখন ইতিহাসকে বিবেচনা করা হয় কালের দর্পণ, যেখানে প্রতিফলিত হয় সমকালের মানব সভ্যতার একটি পুর্ণাঙ্গ চিত্র। সেখানে রাজাদের রাজ্যপাট, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয়ের চিত্র যেমন থাকে, তেমনি থাকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি, তাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের চিত্রও। সেই চিত্র স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে খুব চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জলবায়ূ, নির্মাণ উপকরণের প্রাপ্যতা, জনগণের অর্থনৈতিক সামর্থ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ামকের প্রভাবে গড়ে ঐ অঞ্চলের স্থাপত্যের নিজস্ব চরিত্র, এবং তার সঙ্গে অন্য অঞ্চলের স্থাপত্যের মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সে কারণেই আঞ্চলিক স্থাপত্যের ইতিহাস অন্বেষণ ইতিহাস চর্চায় গুরুত্বপুর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে বাংলাদেশে আঞ্চলিক স্থাপত্যের ইতিহাস চর্চা এখনো তেমন গুরুত্ব পায় নি। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক স্থাপত্যের ইতিহাস চর্চা তো দূরের কথা, এখনো সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বাংলার মধ্যযুগের স্থাপত্য সম্পর্কেই গবেষণা হয়েছে খুব সামান্য।

Dhaka University Institutional Repository

আহমেদ হাসান দানিকে এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ বিবেচনা করা যেতে পারে। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত তার বিখ্যাত গ্রন্থ *Muslim Architecture in Bengal* এ সর্বপ্রথম মধ্যযুগের মুসলিম শাসনামলে বাংলা অঞ্চলের স্থাপত্যিক কীর্তিসমূহের একটি ধারাবাহিক এবং সুসংবদ্ধ ইতিহাস রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থে তিনি ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা লগ্ন থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের শেষে বাংলার নবাবী যুগের অবসান পর্যন্ত সময়ের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যসমূহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তার পাণ্ডিত্যপুর্ণ বিশ্লেষণ যোগ হওয়ায় এই গ্রন্থ থেকে বাংলা স্থাপত্যের সামগ্রিক চরিত্র সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছরেরও বেশি সময় জুড়ে বিস্তৃত এই সময়ে সমগ্র বাংলার সকল স্থাপত্যকীর্তির বিশ্লেষণ করতে যে পরিমাণ সময় ও শ্রম দেওয়া প্রয়োজন দানির একার পক্ষে তা ছিল অসম্ভব। পরবর্তীকালে মাহমুদুল হাসান, পারভীন হাসান ও আব্দুল বারি প্রমুখ গবেষকগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ের স্থাপত্য নিয়ে কাজ করেছেন। মাহমুদুল হাসানের *Mosque Architecture in Pre Mughal Bengal (অক্সফোর্ড, ১৯৭০)* ও পারভীন হাসানের *Sultanate Mosque Types of Bengal : Origin and Development* (হার্ভার্ড, ১৯৮৩) শীর্ষক অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভদুটি মূলত ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় মুঘলদের আগমণের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের স্থাপত্য নিয়ে লেখা। আব্দুল বারির *Mughal Mosque Types of Bangladesh : Origin and Development* শীর্ষক পিএইচডি অভিসন্দর্ভটিকেই (ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০) বলা যায় বাংলার মুঘল যুগের স্থাপত্য নিয়ে পৃথক গবেষণার প্রথম প্রয়াস। এই অভিসন্দর্ভে লেখক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ভূখণ্ডে মুঘল আমলে নির্মিত মসজিদ সমূহকে

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলির আলোকে বিন্যস্ত করে বিশ্লেষণ করেছেন। বলাবাহুল্য তার এই প্রয়াসও সমগ্র বাংলাভিত্তিক, কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের স্থাপত্যিক বৈশিষ্টকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণের কোন চেষ্টাও তিনি করেন নি। এ ছাড়া তার গবেষণায় এই মসজিদ স্থাপত্য সমূহের আর্থসামাজিক গুরুত্ব, বিশেষ করে বাংলায় নগরায়ণের ধারায় এগুলোর ভূমিকাও খুব একটা গুরুত্ব পায় নি।

বর্তমান গবেষণায় আমরা এই দিকটিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। কুমিল্লা অঞ্চল অতি প্রাচীনকাল থেকেই অত্যন্ত সমৃদ্ধ এক নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্র। গুপ্ত, রাত, চন্দ্র, খড়গ প্রভৃতি আঞ্চলিক শাসক গোষ্ঠির অধীনে প্রাক মুসলিম আমলেই এ অঞ্চলে ইটভিত্তিক একটি নিজস্ব নির্মাণরীতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তারপর এ অঞ্চলের স্থাপত্য চর্চায় বিশাল এক ছেদ পড়ে যায়, এমনকি সুলতানি আমলে যখন সমগ্র বাংলায় স্থাপত্য চর্চার সবচেয়ে উজ্জ্বল সময়টা কাটছিল, তখনো এ অঞ্চলে তার ছাপ পড়েনি খুব একটা। সমগ্র বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় সুলতানি আমলের কোন কীর্তি এখন আর টিকে নেই। এরকম একটি মাত্র মসজিদের কথা জানা যায়, তবে দাউদকান্দি থানার বড় গোয়ালিতে অবস্থিত এই মসজিদটিরও কোন অস্তিত্ব এখন আর নেই। তবে মুঘল যুগের বেশ কিছু নিদর্শন এখনো কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এসব নিদর্শন থেকে মুঘল যুগে কুমিল্লায় নগরায়ণের ধারা এবং সে সঙ্গে তার সূত্র ধরে মূঘল প্রশাসনের চরিত্র সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

এ সম্পর্কে সুসংবদ্ধ কোন গবেষণার প্রয়াস যে ইতোপূর্বে হয় নি সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। লালমাই- ময়নামতি অঞ্চলের প্রাক-মুসলিম স্থাপত্য নিয়ে তবু কিছু কাজ হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক একেএম শামসুল আলমের লেখা *ময়নামতি (১৯৬৪)*, হারুনুর রশীদের পিএইচডি

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভ *The Early History of South-East Bengal in the Light of Recent Archaeological Material* (University of Cambridge, 1968), ব্যারি এম. মরিসনের *Lalmai, a Cultural center of Early Bengal an Archaeological Report and Historical Analysis* (London, 1974), এবং এবিএম হোসেন সম্পাদিত *Mainamati-Devaparvata* (Dhaka, 1997) প্রভৃতি রচনা থেকে কুমিল্লা অঞ্চলের প্রাক-মুসলিম স্থাপত্য সম্পর্কে মোটামুটি একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া সম্ভব। তবে এ অঞ্চলের মুসলিম যুগের স্থাপত্য ইতিহাস এখনো প্রায় অজ্ঞাতকুলশীল। বিচ্ছিন্ন ভাবে এ সম্পর্কিত কিছু বর্ণনা কেবল খুঁজে পাওয়া যায় নানা সূত্রে। ১৯১০ সালে ইংরেজ সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত তৎকালীন টিপেরা জেলার গেজেটিয়ারে এই জেলার ইতিহাস ও দর্শণীয় স্থানসমূহের বর্ণনার অংশ হিসেবে জেমস ওয়েবস্টার কুমিল্লার মুঘল স্থাপত্যেরও কয়েকটি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। পাকিস্তান আমলে এ বিষয়ে বিশেষ কোন উদ্যোগ আর লক্ষ্য করা যায় না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই জেলার পৃথক ইতিহাস সঙ্কলনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কবি আব্দুল কাদিরকে সভাপতি ও একেএম যাকারিয়াকে আহ্বায়ক করে এ ব্যাপারে একটি কমিটিও গঠিত হয়, তবে ১৯৭৫ পরবর্তী রাজনৈতিক ডামাডোলে তা অকার্যকর হয়ে পড়ে।[১] ১৯৭৭ সালে আবার নতুন করে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়। কুমিল্লার বিদগ্ধজনদের নিয়ে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়, সেখানে কুমিল্লার ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে পৃথক পৃথক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। কথা ছিল এ সব প্রবন্ধ নিয়ে সঙ্কলিত হবে কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, কিন্তু শেষ পর্যন্ত

---

১. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া(সম্পাদিত), *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস*, কুমিল্লা, ১৯৮০, ভূমিকা, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

সেটিও আলোর মুখ দেখে নি।[২] তবে ঐ বছরই বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার প্রকাশিত হলে তাতে ওয়েবস্টারের রচনায় সঙ্কলিত তথ্যের খানিকটা আধুনিকায়ন ঘটে। এরপর যাকারিয়ারই সম্পাদনায় ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয় বিশাল অবয়বের *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস*, সেখানে স্থাপত্য বিষয়ক পৃথক অধ্যায়ে কুমিল্লার মুঘল স্থাপত্যকীর্তি সমূহেরও বর্ণনা স্থান পায়। কিন্তু এই নিবন্ধটি মোটেই গবেষণাধর্মী নয়।

অথচ কুমিল্লা অঞ্চলে মুঘলদের আধিপত্যের সংগ্রাম, তাদের প্রশাসন ব্যবস্থার চরিত্র এবং সে সঙ্গে এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের বিকাশের ইতিহাসের মূল্যবান সূত্র হিসেবে এখনো দাঁড়িয়ে আছে মুঘল যুগের স্থাপত্যকীর্তিগুলো। কালের প্রবাহে এর অনেকগুলোই এখন ধ্বংসোন্মুখ, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে গুলো নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে এখনো, সেগুলোরও বেশিরভাগই অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণের শিকার হয়ে ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে স্বকীয়তা। সেই সঙ্গে মুছে যাচ্ছে ইতিহাসের অমূল্য সূত্রও। বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য এই সূত্রগুলো একত্রিত করে কুমিল্লা অঞ্চলে মুঘল স্থাপত্যের ইতিহাস অন্বেষণ, এ অঞ্চলের পূর্ববর্তী যুগের স্থাপত্য এবং মুঘল রাজকীয় স্থাপত্যের সঙ্গে তার মিল ও স্বকীয়তা খুঁজে দেখা এবং এর আলোকে কুমিল্লায় মুঘল প্রশাসন ও মুঘল যুগের কুমিল্লার আর্থসামাজিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা। এ উদ্দেশ্যে আমাদের আলোচনাকে তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কুমিল্লায় মুঘল স্থাপত্যবিকাশের প্রেক্ষাপট, অর্থাৎ প্রাক-মুসলিম সময় থেকে শুরু করে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসের সূত্র এবং সে সঙ্গে কুমিল্লা অঞ্চলের স্থাপত্য ও মুঘল স্থাপত্যের

---

২. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া(সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ভূমিকা, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ বৈশিষ্টসমূহ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে কুমিল্লা অঞ্চলে টিকে থাকা মুঘল স্থাপত্যকীর্তিসমূহের বর্ণনা। এখানে লক্ষ্যণীয়, আলোচ্য স্থাপত্য সমূহের বেশির ভাগই মসজিদ। কেবল একটি সমাধি ব্যতিক্রমী উদাহরণ হিসেবে টিকে রয়েছে। কিন্তু প্রাসাদ কিংবা দুর্গের মতো কোন ঐহ্যিক ইমারত খুঁজে পাওয়া যায় নি। এ অঞ্চলের মুঘল প্রশাসনের চরিত্রের মধ্যেই এর কারণ আমরা খুঁজেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে উপসংহারে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

প্রেক্ষাপট

কুমিল্লা জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে মেঘনা নদীর বাম তীরে ৯০°৩১′ থেকে ৯১°২২′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২৩°১০′ থেকে ২৪°১৬′ উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং চাঁদপুর জেলা নিয়ে গঠিত এই বৃহত্তর কুমিল্লা'র পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, উত্তরে বৃহত্তর সিলেট, দক্ষিণে নোয়াখালী এবং পশ্চিমে বৃহত্তর ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা। সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নিয়ে চিহ্নিত একটি প্রশাসনিক এলাকা হিসেবে এই কুমিল্লা অঞ্চলের পরিচিতি অবশ্য খুব বেশি দিনের নয়। ১৭৮১ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে টিপেরা বা ত্রিপুরা জেলা হিসেবে এ অঞ্চলের প্রশাসনিক কাঠামো সর্বপ্রথম প্রস্তুত করা হয়। জেলার সদর দপ্তর কুমিল্লা শহরের নামে ১৯৬১ সালে তদানিন্তন পাকিস্তান আমলে এ জেলার নাম রাখা হয় কুমিল্লা।

পূর্বে অবস্থিত ত্রিপুরার পাহাড়ি এলাকার নামেই এক সময় এই এলাকার পরিচিতি ছিল, তবে আলোচ্য এলাকাটি একটি নদীবিধৌত সমতলভূমি। এ সম্পর্কিত প্রাচীনতম সূত্র পার্জিটার রচিত *পূর্ব ভারতীয় দেশসমূহের প্রাচীন কালের মানচিত্রতে* প্রাগজ্যোতিষ এর পূর্বভাগে লোহিত নদীর অববাহিকায় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত কিরাতস নামে একটি অঞ্চল দেখানো হয়েছে। এই লোহিত নদী বর্তমানের ব্রহ্মপুত্র নদী এবং কিরাতসের অধিকাংশ অঞ্চল এখন কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত।[৩] ব্রহ্মপুত্র নদী তখন লোহিত নামে প্রবাহিত হয়ে বর্তমান মেঘনা নদীর গতিপথ ধরেই সাগরে পড়তো আর এই নদীই ছিল

---

৩. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, ফিরোজা বেগম চৌধুরী ও এম আই চৌধুরী, 'ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগলিক পরিচয়', *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস*, কুমিল্লা, ১৯৮০, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

কিরাতসের পশ্চিম সীমা। এ মানচিত্রে এ অঞ্চলের আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ নদী তিতাসের অবস্থানও চিহ্নিত হয়েছে। তিতাস মেঘনারই একটি শাখা নদী, বর্তমানে এটি বৃহত্তর কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর থানার চাতলপাড় নামক স্থানে মেঘনা নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে সর্পিলাকারে প্রবাহিত হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলারই নবীনগর থানার লালপুর এর নিকটে আবার মেঘনাতে পতিত হয়েছে। এ অঞ্চলের আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ নদী গোমতীও মেঘনার সঙ্গেই সম্পর্কিত — বর্তমান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের তিচনা পাহাড় থেকে উৎপন্ন এই নদী কুমিল্লা শহরের পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দাউদকান্দির নিকটে মেঘনার শাখা কলাতিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই তিনটি নদীই অবশ্য অনেকবার গতি পরিবর্তন করেছে, তবে এই নদীগুলোর অববাহিকার সমতল ভূমিকেই এখনকার কুমিল্লা অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত জোয়াও ডি ব্যারোসের মানচিত্রে এই এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে ট্রপো নামে।[৪] আর ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মেজর রেনেলের জরিপ মানচিত্রে প্রথম টিপেরা নামটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয় এই মানচিত্রে কুমিল্লা শহর ও চাঁদপুর এর সঠিক অবস্থানও চিহ্নিত করা হয়েছে।

এ অঞ্চলে প্রথম মুসলিম আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুঘিসউদ্দিন তুগরলের রাজত্বকাল (১২৭৮-৮২) থেকে শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে ।

প্রাচীনকালে এই অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল সমতট রাজ্য, সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের (খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতক) এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে একটি 'সীমান্তবর্তী' রাজ্য হিসেবে প্রথম যার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক

---

৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১

৫. Fleet, J. F., (Editor), *Corpus Incriptionum Indicarum,* vol. 2, London, 1888, p 309

Dhaka University Institutional Repository

হিউয়েন সাংয়ের বর্ণনাতেও সমতট রাজ্যের নাম পাওয়া যায়।[৬] খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস অবশ্য বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এখানে গুপ্ত উপাধিধারী একটি স্বাধীন রাজবংশ গড়ে উঠেছিল। মহারাজা শ্রী বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর লিপিতে (৫০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দ) তার রাজধানী হিসেবে কৃপুর নামে সুরক্ষিত একটি নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭] কৃপুর এর সঠিক অবস্থান অবশ্য এখনো চিহ্নিত করা যায়নি তবে এই সময় থেকেই এই অঞ্চলে অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি নাগরিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। হিউয়েন সাংয়ের অস্পষ্ট বর্ণনার সূত্র ধরে সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে এ অঞ্চলের ভদ্র নামে আরেকটি রাজবংশকে চিহ্নিত করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভদ্রদের উত্তরাধিকারী হিসেবে এখানে গড়ে ওঠে শক্তিশালী খড়্গ বংশ, যাদের রাজধানী ছিল 'কর্মান্ত বাসক' - চৌদ্দগ্রাম থানার দেউলবাড়ি গ্রামের নিকটবর্তী ঈশানচন্দ্রনগরে এর অবস্থান ছিল বলে মনে করা হয়।[৮] এই শতকেই এ অঞ্চলে রাত নামে আরেকটি রাজবংশের কথা জানা যায় মহারাজ শ্রীধরন রাত এর চারটি লিপি থেকে। এই সব লিপিতে রাজধানী হিসেবে দেবপর্বত নগরীর উল্লেখ রয়েছে। রাত এবং তাদের পরবর্তী দেব ও চন্দ্র বংশের রাজধানী ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র দেবপর্বতেরই ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায় বর্তমানের লালমাই-ময়নামতি এলাকায়। এ সব ধ্বংসাবশেষ থেকে এ অঞ্চলের এক সমৃদ্ধ স্থাপত্য ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

মহারাজ বৈন্যগুপ্তের সময় থেকে ছয়টি ভিন্ন যুগের নির্মাণরীতির নিদর্শনবিশিষ্ট শালবন বিহারকে এই স্থাপত্যরীতির উদাহরণ বিবেচনা করা যেতে পারে। বিহার শব্দের আভিধানিক অর্থ সুখী অবস্থান, ক্রীড়ার্থ ভ্রমণ বা

---

৬. Beal, S., *Buddhist Records of the Eastern World,* vol. IV, Calcutta, 1959. pp 406-7

৭. *Epigraphia Indica,* vol. XV, pp 113,133-34,vol. XXI, p 85

৮. Husain, A.B.M., *Mainamati-Devaparvata*, Dhaka, 1997, p14; Rashid, M.H, 'Recent Archaeological Discoveries', *Bangladesh Historical Studies,* vol III, Dacca, 1978, p 8

Dhaka University Institutional Repository

বিচরণ। তবে বাংলার বৌদ্ধ স্থাপত্যে বিহার শব্দটি ভিক্ষুদের দ্বারা পরিচালিত একটি সুসংবদ্ধ, নিয়মনিষ্ঠ এবং নিস্কলুষ চারিত্রিক জীবন যাপনের স্থান তথা জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রকে নির্দেশ করে। বিহারে ভিক্ষুদের অবস্থান ও ধ্যানের উপযোগী পৃথক কক্ষ, ধর্মালোচনা ও সমাবেশের জন্য প্রশস্ত মণ্ডপ, শ্রান্তি দূর করার জন্য চংক্রমণশালা বা প্রশস্ত বারান্দা, পৃথক রন্ধন ও ভোজন কক্ষ, ভাণ্ডার কক্ষ এবং সর্বোপরি পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে। সাধারণত ক্রুশাকার একটি কেন্দ্রীয় মণ্ডপকে ঘিরে বর্গাকারে বিন্যস্ত উঁচু বেষ্টনী প্রাচীরের গা ঘেঁষে সারিবদ্ধভাবে নির্মিত কতগুলো কক্ষ নিয়ে বিহারের পরিকল্পনা বিন্যস্ত। বিশালায়তন (প্রতি বাহুর দৈর্ঘ ১৭৬.৬ মিটার) শালবন বিহারেও এই ভূমিপরিকল্পনারই প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। চুন-সুরকির গাঁথুনিতে পোড়ানো ইট দিয়ে নির্মিত এই বিহারের অলঙ্করণেও ব্যবহৃত হয়েছে মূলত পোড়ামাটির ফলক। বাংলা স্থাপত্যের পরবর্তী সকল যুগেই এই ইট রীতির নির্মাণশৈলি ব্যবহৃত হয়েছে।

অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে দেবপর্বতের রাজনৈতিক গুরুত্ব খানিকটা কমে গিয়েছিল। কারণ এ সময় বিক্রমপুরকেন্দ্রিক চন্দ্র রাজবংশের শাসকরা সমতট অঞ্চল শাসন করতেন। চন্দ্র রাজাদের আদি রাজধানী দেবপর্বতেই ছিল তবে গৌড়ের পাল বংশের শক্তিহ্রাসের সূত্র ধরে সম্ভবত দশম শতাব্দীতে তারা আরো পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছিলেন।[৯] এ সময়ের স্থাপত্যেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দীর বিশালায়তন রাজোচিত স্থাপত্যের পরিবর্তে এ সময় চারপত্র মুড়া (১৮.২৮ মিটার × ২৭.৪৩ মিটার) অথবা রূপবান কণ্যার মুড়ার (৭৩.১৫ মিটার × ৯১.৪৪ মিটার) মতো অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির স্থাপত্য নির্মিত হয়েছে।[১০]

---

৯. Husain, A.B.M., *Mainamati-Devaparvata*, Dhaka, 1997, Preface, p viii

১০. Morisson, B.M , *Lalmai, a Cultural center of Early Bengal an Archaeological Report and Historical Analysis*, London, 1974, pp.131-133

Dhaka University Institutional Repository

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হয়ে ওঠে অস্থিতিশীল। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে রণবঙ্কমল্ল হরিকেলদেব (আনুমানিক ১২২০ খ্রি.) দামোদরদেব (১২৩৪-৩৬ খ্রি.) ও বীরধরদেব এর মতো তিনটি ভিন্ন রাজবংশের শাসকদের সন্ধান পাওয়া যায় শিলালিপিতে।[১১]

এই সময়ে সমগ্র বাংলার রাজনীতিও এক নতুন মোড় নিচ্ছিল। গৌড় লখনৌতি অঞ্চলে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজির নেতৃত্বে তুর্কি বিজয় অভিযানের পথ ধরে সুত্রপাত ঘটেছিল বাংলায় মুসলিম আধিপত্যের। তবে এই আধিপত্য বাংলার উত্তর-পশ্চিমাংশেই সীমিত ছিল। বখতিয়ারের উত্তরধিকারী খলজি সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি (১২১০-২৭) প্রথম পূর্ববঙ্গ অভিযান করেছিলেন। তবে তার এ অভিযান সফল হয়নি। পুর্ববঙ্গে প্রথম সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন কোন মুসলিম শাসক তা স্পষ্ট জানা যায় না। চতুর্দশ শতকের ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানির *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী* গ্রন্থে মুঘিসউদ্দিন তুগরল (১২৭৮-৮২) এর সঙ্গে দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের সংঘর্ষের সূত্র ধরে উল্লেখ করা হয়েছে তুগরল সোনারগাঁওয়ের নিকটবর্তী নরকিলায় একটি দূর্গ নির্মাণ করেছিলেন।[১২] অর্থাৎ কুমিল্লা জেলার সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চল পর্যন্ত তার রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়েছিল।

পর্যাপ্ত সূত্রের অভাবে এই সময়ে কুমিল্লা অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা কিংবা রাজনীতির গতিধারাও অনুসরণ করা কঠিন। এসময়ে আলোচ্য এলাকার ইতিহাস সংক্রান্ত অনেক গল্পকাহিনী পাওয়া যায় '*রাজমালা*' নামের একটি কাব্যগ্রন্থে। *'প্রাচীন রাজমালা', 'সংস্কৃত রাজমালা'* ও *'সংক্ষিপ্ত রাজমালা'* নামের তিনটি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করে সেগুলোর আলোকে শ্রী কৈলাস চন্দ্র সিংহ *'রাজমালা' বা ত্রিপুরার ইতিহাস* লিখেছেন। এখানে পৌরাণিক রাজা

---

১১. Morisson, B.M , *Ibid,* p.132

১২. বারানি, *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী,* পৃ ৮২

Dhaka University Institutional Repository

যযাতি থেকে আরম্ভ করে বৃটিশ আমল পর্যন্ত কথিত চন্দ্র বংশীয় রাজাদের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এরা অবশ্য মূলত ত্রিপুরার পাহাড়ি এলাকারই শাসক ছিলেন। তবে এসব কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে সংশয় রয়েছে। স্বয়ং রাজমালা প্রণেতা কৈলাস চন্দ্র সিংহও একথা স্বীকার করেছেন। *রাজমালায়* চন্দ্র রাজবংশের ১৪০তম নৃপতি হিসেবে উল্লেখিত এই বংশের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছেংতুমফার রাজত্বকালেই সম্ভবত ত্রিপুরার রাজশক্তি প্রথম ত্রিপুরার পাহাড়ি অঞ্চলের বাইরে আলোচ্য সমতলভূমিতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। *রাজমালায়* হীরাবন্ত খাঁ চৌধুরী নামে জনৈক সামন্তরাজের সঙ্গে সংঘর্ষের সূত্র ধরে 'গৌড়েশ্বরে'র সঙ্গে এই ছেংতুমফার সংঘর্ষের বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৩] এই গৌড়েশ্বর যে একজন মুসলিম নৃপতি ছিলেন, তার অধীনস্ত সামন্ত হীরাবন্ত খাঁ চৌধুরীর নাম থেকেই তা অনুমান করা যায়। যেহেতু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত অন্তত পূর্ববঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাই ছেংতুমফাও ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরবর্তী কোন এক সময়ের শাসক হবেন। *রাজমালা* অনুসারে ছেংতুমফা এর তিনপুরুষ পরের নৃপতি ডাঙ্গরফা'র পুত্র এই বংশের ১৪৫ তম নৃপতি রত্নফা'র সময় ত্রিপুরা রাজ্য গৌড়ের শাসকদের অধীনস্ত একটি সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।[১৪] এই ঘটনার পর থেকেই ত্রিপুরার রাজাদের ঐতিহ্যবাহী 'ফা' উপাধির পরিবর্তে মানিক্য উপাধি গ্রহণ করতে দেখা যায়। রত্নমানিক্যের ১২৮৮ শকাব্দ বা ১৩৬৬ খ্রিস্টাব্দের দুটি মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে। এই সময়ে বাংলার সুলতান ছিলেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ। সিকান্দার শাহের আমলে রাজ্য বিস্তারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না বলে

---

১৩. *রাজমালা*, প্রথম লহর, দ্রষ্টব্য কৈলাস চন্দ্র সিংহ, *'রাজমালা' বা ত্রিপুরার ইতিহাস*, আগরতলা (দ্বিতীয় অক্ষর সংস্করণ), ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৭

১৪. *রাজমালা, প্রাগুক্ত*, পৃ.৪১-৪২

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল করিম মনে করেন রত্নমানিক্যকে যিনি সাহায্য করেছিলেন তিনি সম্ভবত সুলতান ইলিয়াস শাহ।[১৫]

ত্রিপুরা রাজবংশের ১৪৫ তম নৃপতি রত্নমানিক্যের শাসনকাল যদি চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি হয়, তাহলে তার চার পুরুষ আগের নৃপতি ছেংতুমফা'র রাজত্বকাল ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগেই হওয়ার কথা। রাজমালার স্বাক্ষ্য সত্যি হলে এই সময়ের আগেই কুমিল্লা অঞ্চলে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই অধিকার ঠিক কখন বিস্তৃত হয়েছিল, তা সঠিকভাবে বলার উপায় নেই। শিলালিপি অনুসারে সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩০১-২২ খ্রিঃ) ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্ট অভিযান করেছিলেন।[১৬] পূর্ববঙ্গ থেকে শ্রীহট্ট বা সিলেট অঞ্চলে যেতে চাইলে জল-স্থল উভয় পথেই কুমিল্লা অঞ্চলের উপর দিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই তার সময়ে কুমিল্লা অঞ্চল মুসলিমদের অধিকারে ছিল বলে ধরে নিতে হয়। সেই হিসেবে মুঘিসউদ্দিন তুগরলের সময় (১২৭৮-৮২) থেকে শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালের মধ্যেই কখনো এ অঞ্চলে প্রথম মুসলিম আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল।

এই সময় থেকে শুরু করে বাংলায় স্বাধীন সুলতানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত মুসলিমদের এই অধিকার নিরবচ্ছিন্নভাবেই বজায় ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। ফিরোজ শাহের অব্যবহিত পরের নৃপতিদের সময়কাল সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও পূর্ব বাংলার স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের আমলে যে কুমিল্লা অঞ্চল তার অধীনস্থ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার রাজধানী ছিল নিকটবর্তী সোনারগাঁও এবং চট্টগ্রাম পর্যন্ত তার রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল। তিনি চাঁদপুর

---

১৫. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ ১৬৯

১৬. Ahmed, Shamsuddin, *Inscriptions of Bengal,* Vol. IV, Rajshahi,1960, p.25

Dhaka University Institutional Repository

থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি বাঁধ বা রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন[১৭] স্থানীয় লোকজনের কাছে যা এখনো হদ্দীনের পথ নামে পরিচিত। কুমিল্লা অঞ্চলের সমগ্র এলাকার ওপর আধিপত্য বিস্তার না করে তার পক্ষে যে চট্টগ্রাম অভিযানে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না তা বলা বাহুল্য। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের শাসনামল এর পরেই। রাজমালা প্রণেতা কৈলাসচন্দ্র সিংহ বর্ণনা করেছেন ১২২৬ শকাব্দে (১৩৪৭ খ্রি) বাঙ্গালার পাঠান সুলতান শামস উদ্দীন আবুল মোজাফফর ইলিয়াস শাহ ত্রিপুরা আক্রমণ করেন।[১৮] তিনি মহারাজ প্রতাপমানিক্যকে পরাজিত করেছিলেন বলে কৈলাসচন্দ্র সিংহ উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই বর্ণনায় অবশ্য খানিকটা বিভ্রান্তি আছে। ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দের আগে পূর্ববঙ্গ তথা সোনারগাঁও অঞ্চলই দখল করতে পারেন নি, তাই ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে তার ত্রিপুরা আক্রমণ অবান্তর। তবে ইলিয়াস শাহ যে কোন এক সময় ত্রিপুরা আক্রমণ করেছিলেন, এ তথ্য তারই প্রমাণ বহন করছে। ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ (১৩৫৭-৯১) এবং পৌত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মতো প্রতাপান্বিত নৃপতিদের আমলে এই অধিকার হাতছাড়া হওয়ার কোন কারণ ছিল না। তবে আজম শাহের মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনকে ঘিরে যে গোলযোগ বেঁধেছিল, তার প্রেক্ষিতে কুমিল্লা অঞ্চলের ভাগ্যে কী ঘটেছিল তা বলা মুশকিল। এ সময় সম্পর্কে সমকালীন তথ্যসূত্রেরও অভাব রয়েছে।

মুসলিম বিজয়ের সূত্র ধরেই ত্রয়োদশ শতকে বাংলা অঞ্চলের স্থাপত্যেও একটি নতুন রীতির সূচনা ঘটেছিল। বাংলায় প্রচলিত ইট রীতির নির্মাণশৈলির সঙ্গে ইসলামের ধর্মীয় প্রয়োজন এবং মুসলিম বিজেতাদের পিতৃভূমি ইরান-আফগানিস্তানে প্রচলিত পাথর ও খিলানভিত্তিক নির্মাণকৌশলের সমন্বয়ে এই

---

১৭. Sarkar, Sir J N, *Studies in Mughal India*, Calcutta, 1919, p.122

১৮. *রাজমালা, প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

নতুন রীতি গড়ে উঠেছিল। এই নতুন স্থাপত্যরীতিতে পূর্ববর্তী যুগের বিহার ও মন্দিরের স্থান দখল করেছিল মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রভৃতি। বাংলার প্রথম মুসলিম বিজেতা ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজিই অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা, সমাধি ও খানকাহ নির্মাণের মাধ্যমে এই রীতির সূচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। তার সময়ে নির্মিত কোন স্থাপত্য অবশ্য এখন আর টিকে নেই। পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে অবস্থিত জাফর খান গাজির সমাধি সংলগ্ন মসজিদ (১২৯৮) এই নতুন রীতির সর্বপ্রাচীন জ্ঞাত নিদর্শন। আয়তাকার এই ইমারতটি বিশালায়তন এবং অনেকগুলো গম্বুজে আচ্ছাদিত। এতে ইটের পাশাপাশি দেওয়ালের গায়ে বহিরাবরণ হিসেবে পাথরের আস্তরণ ব্যবহৃত হয়েছে। এই পাথরের বেশিরভাগই নিকটবর্তী এলাকার হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে নেওয়া। চতুর্দশ শতকের শেষার্ধে নির্মিত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদে (১৩৭৫) পশ্চিম এশিয়ার স্থাপত্য পরিকল্পনার হুবহু অনুকরণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। মাঝে উন্মুক্ত অঙ্গন রেখে তাকে ঘিরে তিনদিকে রিওয়াক ও একদিকে নামাজগৃহ নির্মাণের এই পরিকল্পনা অবশ্য বাংলার আবহাওয়ার সঙ্গে মানানসই ছিল না, যে কারণে এ পরিকল্পনার ব্যবহার আর কখনোই দেখা যায়নি। চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলার স্থানীয় বংশোদ্ভুত প্রথম মুসলিম শাসক জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকাল (১৪১০-৩৩) থেকে মুসলিম স্থাপত্যে বাংলার স্থানীয় রীতি-কৌশল প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করে। পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত একলাখি সমাধিকে এই নতুন রীতির সূচনা বিন্দু মনে করা হয়।। বর্গাকার এই সমাধিটি সম্পুর্ণ ইট দিয়ে নির্মিত এবং একগম্বুজে আচ্ছাদিত। লক্ষ্যণীয়, বাংলার গ্রামীণ স্থাপত্যে বাঁশ ও খড় দিয়ে নির্মিত কুঁড়েঘরের অনুকরণে এই সমাধির কর্নিশ বাঁকানো, এবং কুঁড়ে ঘরের চার কোণের বাঁশের খুঁটির অনুকরণে এর চারকোণে রয়েছে চারটি বিশালাকার পার্শ্ববুরুজ। সে সঙ্গে অলঙ্করণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে পোড়ামাটির ফলক। পুরো সুলতানি আমল জুড়ে এই বাংলা রীতির স্থাপত্য বাংলার সুলতানদের সমৃদ্ধির প্রতীক হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে গৌড়-পাণ্ডুয়া ও তার আশেপাশের নাগরিক পরিবেশে এই রীতির প্রচুর স্থাপত্য নির্মিত হয়েছে। তবে পাশপাশি বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় ইসলাম প্রচারক সুফি সাধক ও মুসলিম সেনাপতিদের তত্ত্বাবধানেও নির্মিত হয়েছে অনেক মসজিদ ও খানকাহ।

জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহের আমলে কুমিল্লা অঞ্চলও তার অধীনস্ত ছিল। চট্টগ্রামের টাকশাল থেকে তার মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল এবং আরাকানের রাজারা তার সামন্ত ছিলেন। কুমিল্লা অঞ্চলের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন না করে সুদূর আরাকান পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া যে তার পক্ষে সম্ভব ছিল না তা সহজেই অনুমেয়। তার পুত্র আহমদ শাহ (১৪৩৩-৩৬) এবং পরবর্তী সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৩৬-৫৯) ত্রিপুরা রাজ্যের অধিপতি ছিলেন মহারাজ ধর্মমানিক্য। *রাজমালা* কাব্য অনুসারে তিনি ৩২ বছর (১৪৩১-৬২ খ্রি.) রাজত্ব করেছিলেন। *রাজমালা* প্রণেতা কৈলাস চন্দ্র সিংহ এ কথাও বলেছেন 'তিনি মুসলিমদের কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার মানসে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তিনি ভীষণ সংগ্রামে আবুল মোজাহেদ আহমদ শাহকে জয় করতঃ সূবর্ণগ্রাম লুণ্ঠন পূর্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।'[১৯] এই তথ্য তিনি কোথায় পেয়েছেন তা অবশ্য বর্ণনা করেন নি। এর সমর্থনে অন্য কোন সূত্রেও আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ধর্মমানিক্যের সময়েই যে ত্রিপুরার রাজাদের আধিপত্য প্রথমবারের মতো কুমিল্লার সমতল ভূমিতেও বিস্তৃত হয়েছিল তার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় কুমিল্লা শহরের ধর্মসাগর দীঘির পাড়ে পাওয়া একটি শিলালিপিতে। এই লিপি

---

১৯. *রাজমালা, প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৪-৪৫

Dhaka University Institutional Repository

অনুসারে ধর্মমানিক্য ১৩৮০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে ধর্মসাগর দীঘি খনন করিয়েছিলেন এবং এ উপলক্ষ্যে উপরোক্ত অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করেছিলেন।[২০] কুমিল্লা শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ধর্মমানিক্যের রাজ্যসীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের অভাবে তা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে পরবর্তীকালের মেহেরকুল পরগণা যে অন্তত তার রাজ্যসীমার অন্তর্ভূক্ত ছিল তা মেনে নেওয়া যেতে পারে। *রাজমালা* অনুসারে তার পরবর্তী ত্রিপুরারাজ ছিলেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপমানিক্য। তবে অধার্মিক এই নৃপতিকে হত্যা করে তার কনিষ্ঠ ভাই মুকুটমানিক্য রাজা হয়েছিলেন। *রাজমালা* অনুসারে এর পরবর্তী ত্রিপুরারাজ ধন্যমানিক্য একজন অত্যন্ত প্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন এবং তিনি ১৪৯০ থেকে ১৫২০ সাল পর্যন্ত ৩০ বছর রাজত্ব করেছিলেন।[২১] তার সময়ে মেহেরকুল, পট্টিকারা, গঙ্গামন্ডল, বাগমারি, বেজুরা, কৈলা, ভানুগাছ, বিষ্ণুপুরা, লংলা, বরদাখাত, খন্দল প্রভৃতি পরগণা ত্রিপুরা রাজ্যের অন্ত র্ভূক্ত হয়েছিল। এ তথ্য সত্যি হলে বর্তমানের প্রায় সমগ্র কুমিল্লা অঞ্চলেই তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের মৃত্যু এবং ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের গৌড়ের সিংহাসন দখলের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার রাজনীতিতে যে দুঃসময় ও বিশৃঙ্খলা চলছিল, তার প্রেক্ষিতে ধন্যমানিক্যের এই সাফল্য লাভ বিচিত্র ছিল না। *রাজমালায়* উল্লেখ আছে ধন্যমানিক্য দুবার চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন এবং এই বিজয়ের স্মারক হিসেবে মুদ্রা জারি করেছিলেন। মুদ্রা প্রমাণেও এ তথ্য সমর্থিত হয়। আব্দুল করিম অবশ্য মনে করেন প্রকৃতপক্ষে ধন্যমানিক্য কখনোই চট্টগ্রাম জয় করতে পারেন নি, যদিও মুদ্রায় তিনি সে রকম দাবি করেছেন।[২২] তবে গৌড়ের

---

২০. *রাজমালা, প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৪

২১. *রাজমালা, প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৭-৪৮

২২. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ ২৬৩

Dhaka University Institutional Repository

পরাক্রমশালী সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ যে ধন্যমানিক্যের এই আধিপত্য মেনে নেন নি তার প্রমাণ আছে। সুলতান হুসেন শাহ অন্তত চার বার ত্রিপুরা রাজ্যে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন বলে জানা যায়। যুদ্ধে ধন্যমানিক্য ঠিক পেরে ওঠেন নি, হুসেন শাহের প্রেরিত দুজন সেনাপতি গৌরাই মল্লিক এবং হৈতন খাঁ উভয়ের কাছেই তিনি পরাজিত হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বর্তমান কুমিল্লা অঞ্চলের অধিকার ছেড়ে দিয়ে তাকে ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। শুধু তাই নয় শ্রীকর নন্দীর *অশ্বমেধ পর্ব* নামক কাব্যগ্রন্থে পাওয়া তথ্য সত্যি হলে ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলেরও কিছু অংশ তার হস্তচ্যুত হয়েছিল।[২৩] হুসেন শাহ যে সত্যিই ত্রিপুরা রাজ্য জয় করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় শিলালিপিতেও। সোনারগাঁয়ের একটি মসজিদে পাওয়া একটি শিলালিপি অনুসারে 'খানউল আজম ওয়াল মুয়াজ্জম খোয়াস খান' নামে জনৈক ব্যক্তি ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মসজিদটি নির্মাণ করেন এবং তিনি ত্রিপুরার ভূমির সামরিক শাসনকর্তা (সর-ই-লস্কর ই জমিন-ই ত্রিপুরা) এবং মোয়াজ্জমাবাদ এলাকার (ইকলিম ই মোয়াজ্জমাবাদ) উজির (শাসনকর্তা) ছিলেন।[২৪] ১৭৮১ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক টিপেরা জেলা গঠনের আগে কুমিল্লা অঞ্চলের সমতল ভূমি কখনোই ত্রিপুরা নামে পরিচিত ছিল না। তাই এই শিলালিপিতে জমিন-ই-ত্রিপুরা বলতে ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। প্রবল পরাক্রম এই সুলতানের শাসনামলে ৯০৬ হিজরি সনে (১৫০০-০১ খ্রিস্টাব্দ) খোদ কুমিল্লা জেলাতেও একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। দাউদকান্দি থানার বড় গোয়ালিতে এক গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদের অবস্থান ছিল, যদিও বর্তমানে এটি সম্পূর্ণ

---

২৩. *রাজমালা, প্রাগুক্ত*, পৃ ৪২ পাদটীকা ১৯

২৪. Ahmed, Shamsuddin, *Ibid*, p.194

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং এর ধ্বংসাবশেষের ওপর বর্তমানে একটি আধুনিক মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

হুসেন শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী নাসিরউদ্দিন নসরত শাহ (১৫১৯-৩২) উত্তরাধিকার সূত্রে কুমিল্লা অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব পেয়েছিলেন। তবে তার রাজত্বকালের শেষ দিকে দিল্লীর নতুন সম্রাট বাবরের সাথে তার সংঘর্ষের সূত্র ধরে লখনৌতি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ স্থিতি দুর্বল হয়ে পড়ায় কুমিল্লা জেলার অধিকাংশ অঞ্চল তার হস্তচ্যুত হয়েছিল। ঠিক এই সময় ত্রিপুরার সিংহাসনে আসীন ছিলেন চন্দ্র বংশের দুই শক্তিশালী নৃপতি দেবমানিক্য ও তার পুত্র বিজয়মানিক্য। *রাজমালায়* উল্লেখ রয়েছে দেবমানিক্য কুমিল্লার সমতল ভূমিরও দক্ষিণ-পশ্চিমের রাজ্য ভুলুয়া ও চট্টগ্রাম বিজয় করেছিলেন, তবে নসরত শাহের সেনাপতি পরাগল খান ও ছুটি খানের কাছে পরাজিত হওয়ায় তা তার হাতছাড়া হয়েছিল।[২৫] তার সোনারগাঁও বিজয়ের একটি স্মারক মুদ্রাও পাওয়া গেছে।[২৬] আবার *রাজমালায়* তার উত্তরাধিকারী বিজয়মানিক্যও উল্লেখিত এলাকাগুলি জয় করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে, অর্থাৎ দেবমানিক্যের সাফল্য বেশিদিন স্থায়ি হয়নি। *রাজমালা* অনুসারে সোনারগাঁয়ের নিকটবর্তী ধ্বজঘাট, লাক্ষ্যাঘাট ও যাত্রাপুরের নিকটবর্তী পদ্মাঘাটে স্নান করে বিজয়মানিক্য এসব স্থানের নামে স্মারক মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন, এবং তার উল্লেখিত এই তিনটি মুদ্রাই পাওয়া গেছে।[২৭] ত্রিপুরার পরাক্রমশালী এই নৃপতি পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রায় ত্রিশ বছরেরও অধিক সময় সম্ভবত ১৫৩১ থেকে ১৫৬৩ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। বাংলার ইতিহাসে এই সময়টি ছিল রীতিমতো এক ক্রান্তিকাল। গৌড়ের সিংহাসনে ক্ষমতার পালাবদলে এ সময় প্রায় নয়জন

---

২৫. *রাজমালা, প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৮

২৬. মজুমদার, রমেশ চন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস মধ্যযুগ*, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃ ৪৯১

২৭. মজুমদার, রমেশ চন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস মধ্যযুগ*, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃ ৫০৪

400861

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

শাসক [আলাউদ্দিন (দ্বিতীয়) ফিরোজশাহ (১৫৩২-৩৩) গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-৪৮) মুঘল সম্রাট হুমায়ুন (১৫৩৮-৩৯), সম্রাট শেরশাহ (১৫৩৯-৫৫), তার পুত্র ইসলাম শাহ (১৫৪৫-৫৩), শামসুদ্দিন মোহাম্মদ শাহ গাজি (১৫৫৩-৫৫), গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ (১৫৫৬-৬০), দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন (১৫৬০-৬৩) ও তাজখান কররানী (১৫৬৪-৬৫) প্রমুখ] রাজত্ব করেছেন। দিল্লীর মুঘল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক হওয়ায় আইন-ই-আকবরি গ্রন্থেও বিজয় মানিক্যের নাম উল্লেখিত হয়েছে।[২৮] গৌড়ের সিংহাসন নিয়ে এই টানাপোড়েনের সূত্র ধরে রাজত্বের শেষ দিকে বিজয় মানিক্য বেশ সাফল্য পেলেও শুরুর দিকে, বিশেষ করে শেরশাহের সময়ে ত্রিপুরার অন্তর্গত অনেকগুলো পরগনাই তার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। কুমিল্লার মুরাদনগর থানার পিপুড়িয়া কান্দা এলাকায় 'পুরা রাজার জাঙ্গাল' নামে পরিচিত একটি উচুঁ রাস্তা এবং তার পাশ দিয়ে প্রবাহিত স্থানীয় ভাবে 'অদ' বা 'হদ' নামে পরিচিত একটি কৃত্রিম খাল এখনো এ এলাকায় শেরশাহের শাসনের চিহ্ন বহন করছে।

তবে বিজয়মানিক্য কুমিল্লার সমতলভূমিতে যে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, তার মৃত্যুর পর পরই তা আবার হাতছাড়া হয়ে যায়। বিজয়মানিক্যের মৃত্যুর পর তার পুত্র অনন্তমানিক্য রাজা হলেও অচিরেই তার শ্বশুর গোপী প্রসাদের ষড়যন্ত্রে তিনি নিহত হন। ত্রিপুরা রাজ্যে যখন চলছে এই ক্রান্তিকাল ঠিক তখনই আবার গৌড়ের সিংহাসনে তাজখান ও সোলায়মান কররানীর মতো শক্তিশালী নৃপতি অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সোলায়মান কররানীর রাজ্য কেবল বাঙলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি উড়িষ্যা এবং কামরূপ-কামতা রাজ্যও জয় করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে বিজয়মানিক্য কর্তৃক অধিকৃত ঢাকা,

---

২৮. Abul Fazl, *Ain-i Akbari*, (Translated into English by H.S. Jarrett, Corrected and annotated by J.N. Sarkar), Calcutta, 1949, vol. - II, P 117

Dhaka University Institutional Repository

কুমিল্লা, শ্রীহট্ট (সিলেট) ও চট্টগ্রাম অঞ্চল যে তার ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে থাকে নি তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এর ফলে এ সময় সম্ভবত ধর্মমানিক্যের সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের যে সীমারেখা ছিল সে পর্যন্তই তাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

ত্রিপুরার সিংহাসনে বসে উদয়মানিক্য নামধারণকারী গোপী প্রসাদ উদয়পুর নামে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন এবং তিনি চট্টগ্রাম জয়ের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়েছিলেন বলে *রাজমালায়* উল্লেখ রয়েছে। তবে সে অভিযানে তিনি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলে মেহেরকুল দুর্গসহ কুমিল্লার সমতলভূমিও তার হাতছাড়া হয়ে যায়। তবে তার দুই পুরুষ পরের নৃপতি অমরমানিক্য (১৫৭৭-৮১) সম্বন্ধে *রাজমালা* কাব্যে বাড়াবাড়ি রকমের উচ্ছ্বাস রয়েছে। সেই কাহিনী অনুসারে সিংহাসনে আরোহণের পরের বছরেই তিনি একটি বিরাট জলাশয় খননের কাজে হাত দিলে সে কাজে সাহায্যের জন্য তাঁর নির্দেশে 'বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদ রায়, বাকলার বসু, সলৈ গোয়ালপাড়া গাজি, ভাওয়ালিয়া জমিদার, অষ্টগ্রাম, বানিয়াচঙ, রণভাওয়াল, সরাইল ইছা খাঁ ও ভুলিয়া' প্রভৃতি এলাকার জমিদারগণ শ্রমিক পাঠান। আর তরপ-এর জমিদার এ নির্দেশ অমান্য করায় তাঁকে ও তার পুত্রকে পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং তিনি শ্রী হট্টের শাসন কর্তা ফতেহ খানকেও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।[২৯] এই তথ্য সত্যি হলে কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলা তথা সমগ্র ভাটি অঞ্চলের প্রায় সব ভূঁইয়া জমিদারই তার অধীনস্ত ছিলেন বলে মানতে হয়।

তবে এই কাহিনী সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এই সময়ে বৃহত্তর কুমিল্লাসহ সমগ্র ভাটি অঞ্চলের দখলকে কেন্দ্র করে যে সংগ্রাম চলছিল,

---

২৯. কালী প্রসন্ন সেন (সম্পাদক), *শ্রী রাজমালা* (কাব্যগ্রন্থ), আগরতলা, ১৩৬৬ ত্রিপুরাব্দ, তৃতীয় লহর, পৃ ২-৪

Dhaka University Institutional Repository

তার ইতিহাস সে রকমই ইঙ্গিত দেয়। ১৬৭৫-৭৬ সালে দিল্লীর পরাক্রান্ত মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মুনিম খান কররানী বংশীয় শাসক দাউদ খানকে পরাজিত করে গৌড় দখল করে নেন। কিন্তু বাংলার পূর্বাঞ্চলের এই এলাকাটি দখল করতে মুঘলদের আরো প্রায় ৪০ বছর সময় লেগেছিল। ভাটির জমিদার ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলা ও তার পুত্র মুসা খাঁর নেতৃত্বে এ অঞ্চলের একদল পাঠান ভূঁইয়া জমিদার (বারো ভূঁইয়া) শক্তিশালী মুঘলদের বিরুদ্ধেই প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। সেই সব জমিদাররা ত্রিপুরার মতো একটি ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্যের আধিপত্য এত সহজে মেনে নেবেন এটা কল্পনাও করা যায় না। অথচ *রাজমালার* হাস্যকর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে ঈসা খাঁর মসনদ-ই-আলা (মচলান্দানি) উপাধিও নাকি অমর মানিক্যেরই দেওয়া আর মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ত্রিপুরা রাজের কাছে সামরিক সাহায্য নেওয়ার বিনিময়ে তিনি নাকি অমর মানিক্যের স্ত্রীকে 'মা' বলে ডেকেছিলেন।[৩০]

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার, যে ঠিক একই সময়ে বৃহত্তর কুমিল্লার ওপর আধিপত্যের দাবি মুঘলরাও করেছেন। ১৫৮২ সালে প্রণীত রাজা তোড়রমল্লের রাজস্ব তালিকায় (তুমার জমা) মুঘল সম্রাট আকবরের অধীনস্ত সুবাহ বাংলাকে যে ১৯টি সরকারে বিভক্ত দেখানো হয়েছিল, তার মধ্যে সরকার সোনারগাঁও ও সরকার শ্রীহট্টের অন্তর্গত মোট ২১টি পরগনা বৃহত্তর কুমিল্লার অন্তর্গত। এগুলো হলো সরকার সোনারগাঁয়ের উত্তর শাহাপুর, বলদাখাল, বোয়ালিয়া, পুরচন্ডী, পাতাহকারা (পাটিকারা বা পট্টিকারা), বরদীয়া, তুরা (টুরা বা টোরা), চান্দপুর, দক্ষিণ শাহপুর, রায়পুর, সেখেরগাঁও বা সিংহেরগাও, সকরী বা শকদী, সিউজাল বা শিরচল বা শ্রীচাইল, করদী, মেহেরকুল, নেহার,

---

৩০. *শ্রী রাজমালা* (কাব্যগ্রন্থ), তৃতীয় লহর পৃ ১৫-১৬

Dhaka University Institutional Repository

মনোহরপুর (গঙ্গামণ্ডলের অংশ), মহিচাল, নারায়ণপুর ও হোমনাবাজু আর শ্রীহট্ট সরকারের সতের খন্ডল।[৩১]

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সময় ত্রিপুরা রাজ কিংবা মুঘল সম্রাট কারোই আধিপত্য ছিল না বৃহত্তর কুমিল্লায়। আকবর নামার বর্ণনা এবং অন্যান্য সূত্রের সাক্ষ্য মিলিয়ে ঈসা খাঁর রাজ্যের যে সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে তা থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট, আসলে এ সময় বৃহত্তর কুমিল্লা তারই রাজ্যভূক্ত ছিল। বুড়িগঙ্গা নদীর পশ্চিম তীর থেকে শুরু করে পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত পুরো বলদখাল পরগনা, পট্টিকারা এবং সরাইল পরগনাসহ এখনকার কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলার প্রায় পুরোটাই এমনকি ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত ঈসা খাঁর উত্তরাধিকারী জমিদারদের অধীনস্ত ছিল। তবে ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে ঈসা খাঁর সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণই ছিল। *রাজমালা* কাব্যে অমর মানিক্যের পুত্র রাজধর মানিক্যের সময়ে মুসলিমরা ত্রিপুরা আক্রমণ করেছিল এবং বর্তমান কসবার নিকটবর্তী কৈলারগড় এ অনুষ্ঠিত যুদ্ধে ত্রিপুরা বাহিনীর জয়ের পর সেখানে রাজধরের থানা নির্মিত হয়েছিল বলে উল্লেখ থাকলেও অন্য কোন সূত্রে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না বলে এ তথ্যটি সত্য বলে মনে হয় না।

ঈসা খাঁর মৃত্যুর পর তার পুত্র মুসা খাঁ ভাটি অঞ্চলের কর্তৃত্ব লাভ করেন। মুঘলদের সাথে দীর্ঘ সংগ্রামের পর সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুবাহদার ইসলাম খান চিশতির কাছে পরাজিত হয়ে তিনি আত্মসমর্পণ করলে ভাটি অঞ্চলের জমিদার হিসেবে তাকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বৃহত্তর কুমিল্লায় তাই উত্তর ভারত থেকে আগত মুঘল কর্মকর্তাদের আগমন ঘটেনি তখনো। ১৬১৮ সালে বাংলার সুবাহদার ইব্রাহিম খান ফতেহ জঙ্গই প্রথম ত্রিপুরার রাজাদের রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ নেন। তার এই উদ্যোগের কারণ সম্পর্কে কিছু জানা

---

৩১. Abul Fazl, *Ain-i Akbari*, vol. III, P 59-60.

Dhaka University Institutional Repository

যায় না, তবে মির্জা নাথনের *বাহরিস্তান-ই-গায়েবি* এবং *রাজমালার* বর্ণনা থেকে জানা যায় মুঘল সেনাপতি ইসফানদিয়ার খান, মুসা খান মসনদ-ই-আলা এবং নৌসেনাপতি বাহাদুর খানের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণে রাজধরের পুত্র যশোধরমানিক্যের সেনাবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং আরাকানের দিকে পালিয়ে যাওয়ার পথে যশোধর পরিবার-পরিজনসহ বন্দী হন। ত্রিপুরা রাজ্য দখল করার পর মুঘলরা উদয়পুরে একটি থানা স্থাপন করে এবং মির্জা নুরুল্লাহ্‌কে সেখানকার থানাদার নিযুক্ত করা হয়। ১৬২৬ সালে কল্যাণমানিক্যের শাসনলাভের আগে পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য সরাসরি মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। *রাজমালা* কাব্যে উল্লেখ আছে 'দৈবচক্রে অনেক মুঘল সৈন্যের মৃত্যু হলে মুঘলরা উদয়পুর ছেড়ে মেহেরকুল (বর্তমান কুমিল্লা শহরের নিকটবর্তী) এলাকায় চলে যায়'[৩২] এবং এই সুযোগেই কল্যাণমানিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন। এরপরেও মুঘলরা আবার ত্রিপুরা আক্রমণ করেছিল এবং পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছিল বলে *রাজমালায়* উল্লেখ রয়েছে। তবে এ সময় মুঘলদের ত্রিপুরা আক্রমণের দৃশ্যত কোন কারণ ছিল বলে মনে হয় না। সুবাহদার শাহ সুজার আমলে নতুন করে বাংলার রাজস্ব তালিকা প্রণীত হলে তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের 'সরকার উদয়পুর'কে সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত দেখানো হয়েছে। আবার একই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দমানিক্যের দুটি তাম্রলিপি অনুসারে জানা যায় যে তিনি বর্তমান কুমিল্লার মেহেরকুল পরগণায় ভূমিদান করছেন[৩৩], অর্থাৎ এ অঞ্চলের ভূমির মালিক তিনিই ছিলেন। এই লিপিতেই আবার তাঁর রাজ্যকে বলা হয়েছে 'সরকার উদয়পুর'। তাই মনে হয়

---

৩২. *শ্রী রাজমালা* (কাব্যগ্রন্থ), তৃতীয় লহর পৃ ৭০

৩৩. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া , 'রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাস (মধ্যযুগ)', *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস*, কুমিল্লা, ১৯৮০, পৃ ১৪১-৪২

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় ত্রিপুরায় স্বতন্ত্র একটি রাজ্য ছিল, এবং তা মুঘলদের একটি করদ রাজ্য ছিল।

এই দুটি লিপির পাঠ থেকেই জানা যায়, সে সময় বর্তমান কুমিল্লা শহরের গোবিন্দপুর ও কান্দিরপাড় মৌজার অধিকাংশ এলাকা জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তবে এ সময়েই যে এখানে নগরায়ণের সূচনা হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। মেহেরকুলে মুঘলদের একটি থানা ছিল একথা আগেই বর্ণীত হয়েছে। এই থানাকে কেন্দ্র করেই এখানে প্রশাসনিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। কুমিল্লা শহরের শাহ সুজা মসজিদ তারই সাক্ষ্য বহন করেছে। শিলালিপি হারিয়ে যাওয়ায় এ মসজিদের প্রকৃত নির্মাণ কাল জানা যায় না। তবে স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় এটি সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কখনো নির্মিত হয়েছিল বলেই মনে হয়। মসজিদটির নির্মাণ সম্পর্কে এ অঞ্চলে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে দুটি মত প্রচলিত আছে। প্রথমটি অনুসারে কল্যাণমানিক্যের আমলে ত্রিপুরা রাজ্য জয় করে সেই বিজয়ের স্মৃতিতে শাহ সুজা এটি নির্মাণ করেন। শাহ সুজা যে কখনো ত্রিপুরা আক্রমণ করেননি তা আগেই বর্ণীত হয়েছে। তাই এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। অন্য জনশ্রুতিটি আরও অবিশ্বাস্য। এই কাহিনী অনুসারে এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন রাজা গোবিন্দমানিক্য। এর সূত্র ধরে শাহ সুজার সঙ্গে গোবিন্দমানিক্যের বন্ধুত্বের এক কল্পকাহিনী ফাঁদা হয়েছে। সিংহাসনে আরোহনের সময় ভাই নক্ষত্ররায়ের সাথে সংঘর্ষে গোবিন্দমানিক্য শাহ সুজার সাহায্য নিয়েছিলেন, আবার রাজ্যহারা শাহ সুজা আরাকানের দিকে পালিয়ে যাওয়ার সময় স্বেচ্ছা নির্বাসিত গোবিন্দমানিক্যের সাথে ঘটনাচক্রে মিলিত হলে তাকে একটি মূল্যবান হীরের আংটি ও একটি তরবারি উপহার দেন। দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আসীন হয়ে গোবিন্দমানিক্য সেই আংটি ও তরবারি বিক্রি করে পাওয়া টাকায় মসজিদটি নির্মাণ করেন। নানা কারণে এ কাহিনীটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রথমত গোবিন্দমানিক্য ও নক্ষত্ররায়ের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যেকার সংঘর্ষ যখন চলছিল ঠিক সেই সময়েই শাহ সুজাও তার ভাইদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন এবং এ সংঘর্ষের সূত্র ধরেই তাকে আশ্রয়ের সন্ধানে আরাকানের দিকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। তাই এ সময় ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ যুদ্ধে মনোযোগ দেওয়ার মতো অবস্থা আসলে তার ছিল না। তাছাড়া রাজমহলে বসবাসরত প্রবল পরাক্রান্ত মুঘল যুবরাজ শাহ সুজার সাথে ত্রিপুরার মতো ছোট্ট একটি রাজ্যের রাজা গোবিন্দমানিক্যের বন্ধুত্বও খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। আর যদি এ রকম কোন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেও, তাহলে এরকম একটি ইমারত নির্মাণের খরচ যোগাতে ত্রিপুরারাজ বন্ধুর স্মৃতি চিহ্ন বিক্রি করে দেবেন সেটা আরো অবিশ্বাস্য। বরং এটা হওয়াই স্বাভাবিক যে মেহেরকুলের মুঘল ঘাঁটির কোন কর্মকর্তাই হয়তো এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং সুবাহদারের নামে এর নাম দিয়েছিলেন শাহ সুজা মসজিদ।

ভাটি অঞ্চলের আধিপত্য নিয়ে বারো ভুইয়াঁদের সাথে সংঘর্ষের সূত্র ধরেই কুমিল্লা অঞ্চলে আগমন ঘটেছিল মুঘলদের। এ অঞ্চলে তো বটেই বাংলায় আগমনের পূর্বেই উত্তর ভারতে মুঘলরা নিজস্ব একটি স্থাপত্যরীতি গড়ে তুলেছিল। মুঘলরা নিজেদের ভাবতেন পারসিক রাজাদের উত্তরসূরি, তাদের স্থাপত্যেও এই ভাবনার প্রতিফলন পাওয়া যেত। আগের সাড়ে তিনশো বছর ধরে ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকরা যে স্থাপত্য রীতি গড়ে তুলেছিলেন, তার চরিত্র ছিল মূলত ধর্মীয় — এমন নয় যে তখন প্রাসাদ কিংবা দুর্গের মতো জাগতিক ইমারত নির্মিত হয়নি কিন্তু মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ ও সমাধির মতো ধর্মীয় ইমারতগুলোই তখন গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। এমনকি ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুফি সাধকদের আস্তানাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মসজিদ কিংবা খানকাহগুলোই কখনো কখনো রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মুঘল আমলে স্থাপত্যের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়ে গুরুত্ব পেতে শুরু করে জাগতিক স্থাপত্য। মুঘল সম্রাটরা নিজেদের রাজকীয় শৌর্য তাদের

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপত্যেও প্রতিফলিত করেছিলেন। সম্রাট আকবরই (১৫৫৬-১৬০৫) ছিলেন এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ - দিল্লীর হুমায়ুনের সমাধি থেকে শুরু করে আগ্রা-ফতেহপুর সিক্রির দুর্গ ও প্রাসাদসমূহে তার উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজকীয় শৌর্যের প্রতিফলন ঘটেছিল। পাশাপাশি আকবর সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধের যে ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন, তার অংশ হিসেবে মুঘল স্থাপত্যে স্থানীয় ঐতিহ্যেরও প্রতিফলন ঘটানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ফলে মুঘল স্থাপত্য ছিল ভারতবর্ষে প্রচলিত স্থানীয় ও মুসলিম যুগের নির্মাণশৈলির সঙ্গে পারসিক রাজকীয় পরিকল্পনা ও ধ্যান-ধারণার সার্থক সম্মিলন। এই রীতির চূড়ান্ত উৎকর্ষ অর্জিত হয়েছিল স্থাপত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে। তার স্ত্রীর সমাধি হিসেবে নির্মিত তাজমহল নিঃসন্দেহে মুঘল রাজকীয় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। মুঘল সম্রাটদের অনুকরণে তাদের অধীনস্ত আমির-ওমরাহ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তারাও অনুরূপ স্থাপত্য নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। এ ক্ষেত্রে বাংলা অঞ্চল ছিল ব্যতিক্রম। মুঘল বিজয়ের পরে উত্তর ভারত থেকে আসা কর্মকর্তারাই বাংলার প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু বাংলা বিজয়ের শুরুতেই এ দেশের জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারায় যে ধাক্কা খেয়েছিল, তার কারণেই এরপর আর কখনোই বাংলায় স্থায়ি আবাস গড়ার চিন্তা করেনি তারা।[৩৪] ফলে বাংলায় রাজকীয় ধাঁচের মুঘল স্থাপত্য, বিশেষ করে জাগতিক ইমারত নির্মিত হয়েছে খুবই কম। ব্যতিক্রম নয় কুমিল্লা অঞ্চলও। তবে মুঘলদের আগমনের পর বাংলার সুলতানি স্থাপত্যরীতির স্বকীয়তা অর্থাৎ আস্তরণবিহিন ইটের দেওয়াল, বাঁকানো কর্নিশ, ছাদ পর্যন্ত উঁচু পার্শ্ববুরুজ, অনুচ্চ অর্ধগোলাকার ও শীর্ষচূড়াবিহিন গম্বুজের

---

৩৪. Eaton, R.M., *Rise of Islam and the Bengal frontier 1204-1760*, p. 144

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার এবং পোড়ামাটির ফলক দিয়ে অলঙ্করণ প্রভৃতি হারিয়ে গিয়ে তার স্থলে মুঘল রাজকীয় স্থাপত্যরীতির প্রভাবে পলেস্তারা আচ্ছাদিত দেওয়াল, সমান্তরাল কর্নিশ, ছাদ ছাড়িয়ে উর্ধগামী ও শীর্ষে গুলদস্তাযুক্ত পার্শ্ববুরুজ, শীর্ষচুড়াশোভিত কন্দাকৃতির গম্বুজের ব্যবহার প্রভৃতি ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিল। বাংলায় এই রীতির ব্যবহার প্রথম লক্ষ্য করা যায় সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে নির্মিত বগুড়ার শেরপুরে অবস্থিত খেরুয়া মসজিদে (নির্মাণকাল ১৫৭৪), কিন্তু তা জনপ্রিয় হয়েছিল শাহজাহানেরও মৃত্যুর পর, সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে (১৬৫৯-১৭০৭)। সুবাহদার শায়েস্তা খানের আমলে ঢাকা ও তার আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় শাহজাহানের স্থাপত্যকীর্তি সমূহের কিছু কিছু বৈশিষ্ট (যেমন নয় পাঁপড়ি বিশিষ্ট বহুখাঁজ খিলান, শিরাল গম্বুজ, অর্ধগম্বুজের নিচে উন্মুক্ত প্রবেশদ্বার প্রভৃতি) নিয়ে গড়া লালবাগ কমপ্লেক্স এবং তার অভ্যন্তরের পরি বিবির সমাধি ও তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ এবং এছাড়াও ঢাকাতেই অবস্থিত হাজি খাজা শাহবাজের মসজিদ কিংবা সাতগম্বুজ মসজিদ প্রভৃতি এরপর বাংলার স্থাপত্যের আদর্শে পরিণত হয়। কুমিল্লা অঞ্চলে মুঘল স্থাপত্যের সূচনাও হয়েছিল এ রকম সময়েই, গোবিন্দমানিক্যের রাজত্বকালে; তাই কুমিল্লার মুঘল স্থাপত্যেও এ অঞ্চলের প্রাক-ইসলামি যুগের সমৃদ্ধ স্থাপত্য ঐতিহ্যের প্রভাব বাইরে থেকে চোখে পড়ে না।

গোবিন্দমানিক্যের পর তার উত্তরাধিকারী চার পুত্র রামদেবমানিক্য, দ্বিতীয় রত্নমানিক্য, মহেন্দ্রমানিক্য এবং দ্বিতীয় ধর্মমানিক্যের আমলে ত্রিপুরা রাজ্য এমনই মুঘলদের পরোক্ষ শাসনের অধীন ছিল। তবে তার সীমানা বিস্তৃত ছিল ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল এবং পরবর্তীকালে নুরনগর পরগণা হিসেবে পরিচিত বুড়িগঙ্গা নদীর পূর্ব তীরবর্তী একটি অংশ পর্যন্তই। কুমিল্লা জেলার বাকি অংশ ছিল মুঘলদের অধীন। নবীনগর, মুরাদনগর ও বাঞ্ছারামপুর থানার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত বলদাখাল বা বরদাখাত পরগণাসহ জেলার বিরাট এলাকা

Dhaka University Institutional Repository

সে সময় ঈসা খাঁর উত্তরাধিকারী জমিদারদের অধীনস্ত ছিল। উত্তরের সরাইল পরগণাসহ আরেকটি বড় অংশ ছিল সরাইলের দেওয়ান বংশীয়দের জমিদারি। চাঁদপুর ও বর্তমান কুমিল্লা জেলার অধিকাংশ এলাকাতেও ঈসা খাঁর বংশধরদেরই জমিদারি ছিল, আর এ সব জমিদাররা ছিলেন মুঘলদের অনুগত। তবে মুখে মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করলেও ত্রিপুরার রাজারা সুযোগ পেলেই তাদের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করতে দ্বিধা করতেন না। নবাব মুর্শিদ কুলি খানের জামাতা শুজাউদ্দিনের সময়ের একটি ঘটনা থেকে এ রকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৭২২ সালে মুর্শিদ কুলি বাংলার যে নতুন রাজস্ব তালিকা (জমা কামেল তুমারি) প্রস্তুত করেন তাতে ত্রিপুরা রাজ্যকেও উদয়পুর সরকার নামে সুবাহ বাংলার অন্তর্ভূক্ত দেখানো হয়েছে। এই সরকারের অধীনস্ত পরগণাসমূহ ছিল ত্রিপুরার মহারাজার জমিদারি। বরদাখাত পরগণাসহ জেলার বাকি অংশে সে সময় জমিদার ছিলেন ঈসা খাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত জনৈক আগা সাদেক। ১৭৩২ সালে ঢাকার নায়েব সুবাদার ও শুজাউদ্দিনের জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খানের অধীনস্ত সেনাপতি মীর হাবিব আগা সাদেকের সহায়তায় এবং ত্রিপুরা রাজ পরিবারের সদস্য জগৎ রায়ের প্ররোচনায় ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় ধর্মমানিক্য যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান এবং মীর হাবিব রাজধানী উদয়পুরসহ সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য জয় করে এর নাম রাখেন রওশনাবাদ। জগৎ রায়কে জগৎমানিক্য উপাধি দিয়ে বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার সমতলভূমিতে অবস্থিত মোট ২২টি পরগণা নিয়ে একটি জমিদারি গঠন করে তার অধীনে ন্যস্ত করা হয়। আগা সাদেক এই রাজ্যের ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং জগৎমানিক্যের সাহায্যার্থে বর্তমান কুমিল্লা শহরে একদল মুঘল সৈন্যের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীকালে এই এলাকাটিই চাকলা রওশনাবাদ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

জগৎমানিক্যের এই সুদিন অবশ্য খুব দীর্ঘস্থায়ি হয়নি। দ্বিতীয় ধর্মমানিক্য নবাব শুজাউদ্দিনের দরবারে উপস্থিত হয়ে সব ঘটনা খুলে বললে পাঁচ বছর পরেই তিনি জগৎমানিক্যকে পদচ্যুত করে তার রাজ্য ফিরিয়ে দেন। ধর্মমানিক্যও নবাবের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে নেন। তবে দ্বিতীয় ধর্মমানিক্য ও জগৎমানিক্যকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার সিংহাসন নিয়ে যে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল পরবর্তীকালে বৃটিশ শাসনকাল পর্যন্ত তারই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় তাদের উত্তরসূরীদের ক্ষমতা লাভের প্রক্রিয়ায়।

১৭৪০ এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এই অঞ্চলে শমসের গাজি নামে জনৈক বিদ্রোহী নেতার আবির্ভাব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একজন ছোটখাটো জমিদার হয়েও এক পর্যায়ে তিনি রাজধানী উদয়পুর সহ সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু বাংলার নবাব মীর কাশিমের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত তিনি পরাজিত হন এবং তাকে তোপের মুখে ফেলে হত্যা করা হয়।[৩৫] মহারাজ কৃষ্ণমানিক্য তার রাজ্য ফিরে পান। ইতোমধ্যে বাংলার রাজনীতিতেই ঘটে যায় এক যুগান্তকারী পালাবদল, মুর্শিদাবাদের স্বাধীন নবাবদের হটিয়ে ক্ষমতায় আসে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৭৬১ সালে কৃষ্ণমানিক্য এক যুদ্ধে কোম্পানির সেনাপতি ম্যাথিউ এর কাছে পরাজিত হলে ত্রিপুরা রাজ্যেও ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে আগের মতোই ত্রিপুরা ব্রিটিশদেরও করদ রাজ্য হিসেবেই তার অস্তিত্ব বজায় রাখে। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর ১৭৮১ সালে কোম্পানি ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত বাকি এলাকা নিয়ে ত্রিপুরা জেলা গঠন করে। এ সময় থেকে ত্রিপুরার রাজাদের জমিদারি সীমিত হয়ে পড়ে ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে।

---

৩৫ . কৈলাস চন্দ্র সিংহ, *'রাজমালা' বা ত্রিপুরার ইতিহাস*, আগরতলা (দ্বিতীয় অক্ষর সংস্করণ), ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ১২৫-২৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুমিল্লা অঞ্চলের মুঘল স্থাপত্যসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

সরাইল মসজিদ

(ভূমি-পরিকল্পনা : ১, আলোকচিত্র : ১-৬)

অবস্থান: পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট সরাইল মসজিদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল থানা সদরের কেন্দ্রস্থল সরাইল বাজারে অবস্থিত। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার উত্তরে এই বাজারটির অবস্থান।

পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলি: মসজিদটি পরিকল্পনায় আয়তাকার (ভূমি-পরিকল্পনা-১)। বাইরে থেকে এর পরিমাপ উত্তর দক্ষিণে ১২.৮০ মিটার এবং পূর্ব পশ্চিমে ৭.৬২ মিটার। দেওয়ালগুলো প্রায় ১.৫ মিটার পুরু বলে অভ্যন্তর ভাগে ইমারতটির পরিমাপ দাঁড়িয়েছে ৯.৮০ মিটার থ ৪.৬২ মিটার। মসজিদে প্রবেশের জন্য রয়েছে খিলানের সাহায্যে নির্মিত মোট ৫ টি প্রবেশপথ। এর মধ্যে পূর্ব দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে রয়েছে ১টি করে প্রবেশ পথ। পূর্ব দেয়ালের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি এর দুই পার্শ্বস্থ দুটি প্রবেশপথ অপেক্ষা প্রশস্ততর। এটির প্রশস্ততা ১.২৭ মিটার । অন্য দিকে পূর্ব দেয়ালের বাকি দুটি প্রবেশপথ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের পথদ্বয়ের প্রতিটির প্রশস্ততা ০.৯১ মিটার। পূর্ব দেয়ালের প্রবেশ পথগুলোয় দুটি করে খিলান ব্যবহৃত হয়েছে আর এই দুটি খিলানের মধ্যবর্তী স্থানের ওপরে রয়েছে খিলান ছাদ। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি দেয়াল থেকে খানিকটা বাইরের দিকে প্রক্ষিপ্ত। এই প্রক্ষেপণের দুই প্রান্তে ঐতিহ্যবাহী মুঘল রীতি অনুযায়ী দুটি আলঙ্কারিক মিনার নির্মাণ করে এটিকে একটি পিস্তাক এর রূপ দেয়া হয়েছিল। বর্তমানে মিনারগুলো প্রায় বিলুপ্ত।

পূর্ব দেয়ালের তিনটি প্রবেশ পথের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে তিনটি মিহরাব। মিহরাব গুলো অর্ধবৃত্তাকার এবং এক্ষেত্রেও যথারীতি

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। এটি ১.০৪ মিটার প্রশস্ত এবং ১ মিটার গভীর। পার্শ্ববর্তী মিহরাবদ্বয়ের ক্ষেত্রে এই পরিমাপ যথাক্রমে ০.৭৪ মিটার এবং ০.৬১ মিটার। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটির মতোই কেন্দ্রীয় মিহরাবটিও একটি আয়তাকার প্রক্ষেপণের মধ্যে স্থাপিত এবং এই প্রক্ষেপণের দুই প্রান্তে রয়েছে আলঙ্কারিক মিনার। মিনারগুলো ছাদ ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে। এগুলোর শীর্ষে রয়েছে কলস নকশার শীর্ষচুড়াযুক্ত খাঁজকাটা ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজ *(cupola)*।

মসজিদটির বাইরের দিকে চার কোনে চারটি অষ্টকোন পার্শ্ববুরুজ রয়েছে (আলোকচিত্র-২)। বুরুজগুলো বপ্র *(Parapet)* ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে। এগুলোর শীর্ষেও রয়েছে কলস নকশা শোভিত শীর্ষচুড়াযুক্ত ছত্রী। মসজিদটির কর্নিশ সামান্য বক্র (আলোকচিত্র-৩), এবং এই বক্ররেখা বরাবর রয়েছে দুটি সমান্তরাল ব্যান্ড।

দেয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন ও ইটের তৈরি সংলগ্ন স্তম্ভের *(Pilaster)* ওপর থেকে নির্মিত দুটি প্রশস্ত আড়-খিলানের *(Transverse Arch)* সাহায্যে মসজিদটির অভ্যন্তরীণ পরিসরকে তিনটি বে'তে বিভক্ত করা হয়েছে (আলোকচিত্র-৪)। এরমধ্যে কেন্দ্রীয় বে'টি অপেক্ষাকৃত বড় এবং বর্গাকার। এর প্রতিবাহুর দৈর্ঘ ৪.৮৮ মিটার। পার্শ্ববর্তী দুটি দুটি বে আয়তাকার। এগুলোর আভ্যন্তরীণ পরিমিতি ৪.৮৮ মিটার x ১.৯৮ মিটার । কেন্দ্রীয় বে'টির উপরে আচ্ছাদন হিসেবে রয়েছে কন্দাকৃতির একটি গম্বুজ। মসজিদ অভ্যন্তরের দুটি আড় খিলান এবং কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথ ও কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপরের খিলানদ্বয়ের উপর থেকে নির্মিত একটি বৃত্তাকার পিপার *(Drum)* উপর সরাসরি গম্বুজটি স্থাপিত হয়েছে। খিলান গুলোর মধ্যবর্তী ত্রিকোন অংশ পূরণ করা হয়েছে ঐতিহ্যবাহী মুঘল পেন্ডেনটিভ দিয়ে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় কেন্দ্রীয় গম্বুজটির দুপার্শ্বস্থ আয়তাকার বেগুলোর প্রতিটির উপরে রয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

দুটি করে ছোট আকারের গম্বুজ। তবে অভ্যন্তরভাগে এই দুটি গম্বুজের নিম্নাংশ প্রকৃত পক্ষে একটি একক খিলান ছাদে আবৃত। খিলানছাদটি চৌচালা আকৃতির (আলোকচিত্র-৫)।

অলঙ্করণ: সরাইল মসজিদের অলঙ্করণে প্রধানত দুটি মাধ্যম ব্যবহৃত হয়েছে — পোড়ামাটি *(terracotta)* এবং পলেস্তারা *(stucco)*। গম্বুজ এবং দেওয়ালগুলো পলেস্তারা দিয়ে আবৃত, বর্তমানে এগুলোর ওপর চুনকাম করা হয়েছে। বাইরের দেওয়ালে এই পলেস্তারা দিয়ে অনেকগুলো অগভীর খোপ নকশা তৈরি করা হয়েছে।

পোড়ামাটির অলঙ্করণ মূলত ব্যবহৃত হয়েছে কেন্দ্রীয় মিহরাব, কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথ আর চারকোনের পার্শ্ববুরুজগুলোয়। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি একটি আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে স্থাপিত। এই ফ্রেমে রয়েছে পুষ্পিত স্ক্রল নকশা, গোলাপ নকশা এবং জালি। বাহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলানের সাহায্যে নির্মিত কেন্দ্রীয় মিহরাবটিও স্থাপিত হয়েছে অনুরূপ একটি ফ্রেমের মধ্যে, এই ফ্রেমটিও একই রকমের নকশা দিয়ে অলঙ্কৃত (আলোকচিত্র-৬)। মিহরাবের খিলানগুলো উত্থিত হয়েছে ইটের তৈরি অষ্টকোন আকৃতির সংলগ্ন স্তম্ভের ওপর থেকে। এই স্তম্ভগুলো ছাঁচে ঢালা ব্যান্ড নকশার সাহায্যে কয়েকটি অংশে বিভক্ত। মিহরাবের কুলুঙ্গির ভেতরের অংশটিতেও ব্যান্ড নকশার সারি রয়েছে, আর এই ব্যান্ডগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে আয়তাকার খোপ নকশার সারি। এই খোপগুলোতেও রয়েছে খাঁজকাটা খিলানের নকশা, আর প্রতিটি খোপের শীর্ষ থেকে ঝুলন্ত একটি করে শিকল ঘন্টার নকশা। পার্শ্ববুরুজগুলোও ছাঁচে ঢালা ব্যান্ড নকশার সাহায্যে কয়েকটি করে অংশে বিভক্ত। এই ব্যান্ডগুলোর উপরে-নিচে রয়েছে পদ্ম-পাঁপড়ির নকশা।

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণকাল : কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের ওপরে স্থাপিত একটি ফারসি শিলালিপি অনুসারে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব-এর রাজত্বকালে ১০৭৪ হিজরি সালে (১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে) এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে।[৩৬]

বর্তমান অবস্থা: স্থানীয় লোকজনের দ্বারা অনেকবার সংস্কার ও সম্প্রসারণের ফলে মসজিদটি এখনো বেশ ভালো অবস্থায় টিকে রয়েছে এবং এটি এখনো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে এই সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণের ফলে বর্তমানে এটির আদিরূপ প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। কেবল মাত্র পেছন দিক থেকেই এখন মূল মসজিদটির অংশ বিশেষ দৃশ্যমান। ১৯৮০'র দশকের গোড়ার দিকে বাকি তিন দিকেই নির্মিত হয়েছে সমতল ছাদ বিশিষ্ট সম্প্রসারিত অংশ যার ফলে মসজিদটি আধুনিক ইমারতের রূপ নিয়েছে।

সাধারণ আলোচনা : শিলালিপি অনুসারে আওরঙ্গজেবের সময়কালে অর্থাৎ মুঘল শাসনের মাঝামাঝি পর্যায়ে নির্মিত হলেও সরাইল মসজিদে বাংলায় প্রচলিত সুলতানি ও মুঘল উভয় যুগেরই স্থাপত্য শৈলির সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়। পিপার ওপর স্থাপিত এবং কলস নকশার শীর্ষচুড়া শোভিত এই মসজিদের কন্দাকৃতির গম্বুজ, গম্বুজের গায়ে ও মসজিদের ভেতরে-বাইরের দেওয়ালে পলেস্তারা অলঙ্করণ, আর পাশ্ববুরুজগুলোর ছাদ ছাড়িয়ে উঠে যাওয়া মুঘল যুগের স্থাপত্য শৈলিরই নিদর্শন। আর এর পোড়ামাটির অলঙ্করণ এবং বক্র কর্নিশ মনে করিয়ে দেয় সুলতানি যুগের স্থাপত্য শৈলিকে।

কেন্দ্রে একটি বড় গম্বুজ এবং চারকোনে চারটি ক্ষুদ্রাকার গম্বুজ বিশিষ্ট এই পরিকল্পনা বাংলার মুঘল স্থাপত্যে এখানেই প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে।[৩৭] বাংলায় এই পরিকল্পনার ব্যবহার অবশ্য শুরু হয়েছে এর কিছুকাল আগেই — অষ্টগ্রামের কুতুবশাহী মসজিদের মধ্য দিয়ে। এই মসজিদটির নির্মাণকাল

---

৩৬. এই শিলালিপিটির পূর্ণ পাঠ ও অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-১,পৃ ১২২

Dhaka University Institutional Repository

আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, তবে তখন পর্যন্ত এ অঞ্চলটিতে মুঘল আধিপত্য বিস্তৃত হয়নি। বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত এই অষ্টগ্রাম মসজিদটি থেকে আলোচ্য সরাইল মসজিদের দূরত্ব মাত্র ২৪ কিলোমিটার — তাই অনুমান করা যায় সরাইল মসজিদে এই পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়েছে অষ্টগ্রাম মসজিদেরই অনুকরণে। মসজিদ পরিকল্পনার এই রূপটি অবশ্য বাংলার কারিগরদের নিজস্ব উদ্ভাবন নয় — সম্ভবত উত্তর ভারত থেকে আমদানি করা হয়েছে এই পরিকল্পনা। দিল্লীর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগাহে অবস্থিত জামাত খানা মসজিদ (আনুমানিক ১৩১০-১৬)।[৩৮] ও বিহারের পাটনায় অবস্থিত শের শাহের মসজিদ (আনুমানিক ১৫৪০)[৩৯] প্রভৃতি ইমারতে অনেক আগেই এই পরিকল্পনার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

---

৩৭. Bari M.A., 'A Unique Variety of Mughal Mosque', *Journal of Bengal Art*, Vol. 2, 1999, p.

৩৮. R.Nath, *History of Sultanate Architecture*, New Delhi, 1978, p.49

৩৯. *Ibid*, p. 89

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ সুজা মসজিদ

(ভূমি-পরিকল্পনা : ২; আলোকচিত্র : ৭-৯)

অবস্থান : শাহ সুজা মসজিদ কুমিল্লা শহরের মোগলটুলি এলাকায় অবস্থিত। এলাকাটি স্থানীয়ভাবে সুজাগঞ্জ নামেও পরিচিত।

পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলি : তিন গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদটি একটি অনুচ্চ দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। এই বেষ্টনী প্রাচীরের পূর্ব প্রান্তের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত একটি আনুষ্ঠানিক প্রবেশ তোরণ পেরিয়ে মসজিদের অঙ্গনে প্রবেশ করতে হয়। বর্তমানে অবশ্য এই অঙ্গনটির ওপরে একটি সমতল ছাদ নির্মাণ করে একে সম্পুর্ণ ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বাইরে থেকে মসজিদটির আদি চেহারা এখন আর দেখা যায় না (আলোকচিত্র-৭)।

প্রবেশ তোরণটি দ্বিতল বিশিষ্ট (আলোকচিত্র-৮)। এর দ্বিতীয় তলার উপরে রয়েছে একটি গম্বুজ আচ্ছাদিত প্যাভিলিয়ন, আর এর দুপাশে রয়েছে তোরণের দুপ্রান্ত থেকে ছাদ ছাড়িয়ে উঠে যাওয়া দুটি মিনার। নিচের তলার সিংহভাগ এলাকা জুড়ে রয়েছে এর কেন্দ্রের বিশাল খিলানপথটি। বাইরের দিকে একটি অর্ধগম্বুজের নিচে উন্মুক্ত এই খিলানপথ তোরণটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে। এর মধ্যে উত্তর দিকের অপ্রশস্ত অংশটির মধ্যে রয়েছে একটি সিড়িপথ, মসজিদের ভেতরের দিক থেকে এই সিড়িপথ বেয়ে তোরণটির দ্বিতীয় তলায় যাওয়া যায়। এই ব্যবস্থা ইঙ্গিত দিচ্ছে এটি আজান দেওয়ার কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছিল।

মসজিদের কিবলা কোঠাটি আয়তাকার, বাইরে থেকে এর পরিমাপ ১৬.৯১ মিটার × ৭.৩৯ মিটার (ভূমি-পরিকল্পনা : ২) । দেওয়ালগুলো ১.২২

Dhaka University Institutional Repository

মিটার প্রশস্ত হওয়ায় ভেতর থেকে এর পরিমাপ দাঁড়িয়েছে ১৪.৪৭ × ৪.৯৫ মিটার। বাংলা স্থাপত্যের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এর চারকোনে রয়েছে চারটি পার্শ্ববুরুজ। বুরুজগুলো ছাদ ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে এবং এগুলোর শীর্ষে রয়েছে পদ্ম-কলস নকশার ফিনিয়াল শোভিত ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজ। অষ্টকোনাকার ড্রামের ওপর স্থাপিত গম্বুজগুলোর শীর্ষেও রয়েছে অনুরূপ পদ্ম-কলস শোভিত ফিনিয়াল। এর মধ্যে মাঝের গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বড়।

মসজিদের কিবলা কোঠায় প্রবেশের জন্য রয়েছে মোট পাঁচটি খিলানকৃত প্রবেশ পথ — পূর্ব দিকের ফাসাদে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে। প্রবেশতোরণের সমান্তরালে অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর (প্রশস্ততা ১.৮৩ মিটার) এবং এটি দেয়াল থেকে বহির্গত একটি প্রক্ষেপণের মধ্যে স্থাপিত। এই প্রক্ষেপণের দুই প্রান্তে রয়েছে অষ্টকোনাকার ক্ষুদ্রাকৃতির মিনার (*Turret*)। এর দুপাশের প্রবেশ পথ দুটির প্রশস্ততা ১.৫২ মিটার। প্রবেশ পথগুলোর বরাবর পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে তিনটি অষ্টকোনাকার মিহরাব। যথারীতি এখানেও কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অন্য দুটি অপেক্ষা বৃহত্তর এবং খানিকটা বাইরের দিকে প্রক্ষিপ্ত।

দেয়ালের গায়ে সংলগ্ন ইটের তৈরী স্তম্ভের ওপর থেকে আড়াআড়িভাবে নির্মিত দুটি প্রশস্ত খিলান মসজিদের অভ্যন্তরভাগকে তিনটি বে'তে বিভক্ত করেছে (আলোকচিত্র-৯)। এর মধ্যবর্তী বে'টি বর্গাকার (প্রতি বাহুর পরিমাপ ৪.৯৫ মিটার) এবং দুপাশের দুটি আয়তাকার (পরিমাপ ৪.৯৫ মিটার × ৩.৭৩ মিটার)। তিনটি বে'র উপরেই আচ্ছাদন হিসাবে রয়েছে সামান্য কন্দাকৃতির *(bulbous)* গম্বুজ। গম্বুজ গুলোর ভার বহনের জন্য অবস্থান্তর পর্যায়ে *(phase of transition)* পেন্ডেনটিভ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অলঙ্করণ : মসজিদের প্রবেশ তোরণটির সমান্তরাল প্যারাপেট জুড়ে রয়েছে বন্ধ পদ্মপাঁপড়ি *(blind marlon)* নকশার একটি সারি। এর সামনের অংশ এবং কিবলাকোঠাটির পূর্ব দিকের ফাসাদ খিলানকৃত গভীর খোপ নকশার সাহায্যে চমৎকারভাবে অলঙ্কৃত। সমান্তরাল বপ্র এবং তার ওপরে গম্বুজের নিম্নাংশের অষ্টকোন ড্রামও বন্ধ পদ্মপাঁপড়ি নকশা দিয়ে অলঙ্কৃত, যদিও সেগুলো এখন ঢাকা পড়ে গেছে সাম্প্রতিক নির্মাণ কাজের আড়ালে। বাইরের দিকের দেওয়ালের নিম্নাংশ বর্তমানে রয়েছে সবুজ রংয়ের টালির আচ্ছাদন, এ ছাড়া পুরো মসজিদটির দেওয়ালই ঢেকে দেওয়া হয়েছে সিমেন্ট-বালির পলেস্তারা দিয়ে। ছাঁচে ঢালা ব্যান্ড নকশার সাহায্যে কয়েকটি অংশে বিভক্ত অষ্টকোনাকার পার্শ্ববুরুজ সমূহের ভিত্তিতে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন কলস নকশা।

পরবর্তী সংস্কার : স্থানীয় লোকজনের উদ্যোগে গঠিত মসজিদ কমিটির তত্ত্বাবধানে এই মসজিদটি অনেকবার সংস্কার করা হয়েছে এবং বর্তমানেও সেখানে আরেক দফা সংস্কারের কাজ চলছে। ১৯৬০ এর দশকের কোন এক সময়ে করা প্রথম দফার সংস্কারের সময়েই মূল কিবলা কোঠাটির সামনে সমতল ছাদে ঢাকা একটি বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছিল, অতি সম্প্রতি সেই বারান্দাটি সম্প্রসারিত করে প্রবেশ তোরণ পর্যন্ত পুরো অংশই ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রথম দফা সংস্কারের সময়েই মূল কিবলাকোঠার দুপাশে দুটি কক্ষ নির্মিত হয়েছিল, যার ফলে মসজিদটির দুপাশের আদি সৌন্দর্য একেবারেই ঢাকা পড়ে গেছে।

নির্মাণকাল ও সাধারণ আলোচনা : স্থানীয়ভাবে শাহ সুজা মসজিদ নামে পরিচিত এ মসজিদে কোন শিলালিপি নেই। মসজিদটির নির্মাণ সম্পর্কে এ অঞ্চলে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে দুটি মত প্রচলিত আছে। প্রথমটি অনুসারে কল্যাণ মানিক্যের আমলে ত্রিপুরা রাজ্য জয় করে সেই বিজয়ের স্মৃতিতে শাহ

Dhaka University Institutional Repository

সুজা এটি নির্মাণ করেন। শাহ সুজা কখনো ত্রিপুরা আক্রমণ করেছিলেন বলে মুঘল বাংলার ইতিহাসে কোন প্রমাণ নেই। তাই এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। অন্য জনশ্রুতিটি আরও অবিশ্বাস্য। এই কাহিনী অনুসারে এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন রাজা গোবিন্দমানিক্য। এর সূত্র ধরে *রাজমালায়* শাহ সুজার সঙ্গে গোবিন্দমানিক্যের বন্ধুত্বের এক কল্পকাহিনী ফাঁদা হয়েছে।[৪০] সিংহাসনে আরোহণের সময় ভাই নক্ষত্ররায়ের সাথে সংঘর্ষে গোবিন্দমানিক্য শাহ সুজার সাহায্য নিয়েছিলেন, আবার রাজ্যহারা শাহ সুজা আরাকানের দিকে পালিয়ে যাওয়ার সময় স্বেচ্ছা নির্বাসিত গোবিন্দমানিক্যের সাথে ঘটনাচক্রে মিলিত হলে তাকে একটি মূল্যবান হীরের আংটি ও একটি তরবারি উপহার দেন। দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আসীন হয়ে গোবিন্দমানিক্য সেই আংটি ও তরবারি বিক্রি করে পাওয়া টাকায় মসজিদটি নির্মাণ করেন। নানা কারণে এ কাহিনীটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রথমত গোবিন্দমানিক্য ও নক্ষত্ররায়ের মধ্যেকার সংঘর্ষ যখন চলছিল ঠিক সেই সময়েই শাহ সুজাও তার ভাইদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন এবং এ সংঘর্ষের সূত্র ধরেই তাকে আশ্রয়ের সন্ধানে আরাকানের দিকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। তাই এ সময় ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ যুদ্ধে মনোযোগ দেওয়ার মতো অবস্থা আসলে তার ছিল না। তাছাড়া রাজমহলে বসবাসরত প্রবল পরাক্রান্ত মুঘল যুবরাজ শাহ সুজার সাথে ত্রিপুরার মতো ছোট্ট একটি রাজ্যের রাজা গোবিন্দমানিক্যের বন্ধুত্বও খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। আর যদি এ রকম কোন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেও, তাহলে এরকম একটি ইমারত নির্মাণের খরচ যোগাতে ত্রিপুরারাজ বন্ধুর স্মৃতি চিহ্ন বিক্রি করে দেবেন সেটা আরো অবিশ্বাস্য। বরং এটা হওয়াই স্বাভাবিক যে মেহেরকুলের মুঘল ঘাঁটির কোন

---

৪০. কৈলাস চন্দ্র সিংহ, *'রাজমালা' বা ত্রিপুরার ইতিহাস*, আগরতলা (দ্বিতীয় অক্ষর সংস্করণ), ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২৫-২৬

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তাই হয়তো এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং সুবাহদারের নামে এর নাম দিয়েছিলেন শাহ সুজা মসজিদ। সম্প্রতি আ.কা.মো. জাকারিয়াও এরকমই অনুমান করেছেন।[৪১]

৪১. আ. কা. মো. জাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৫৫২

Dhaka University Institutional Repository

ভাদুঘর মসজিদ

(ভূমি-পরিকল্পনা-৩; আলোকচিত্র : ১০-১১)

অবস্থান : এক গম্বুজ বিশিষ্ট ভাদুঘর মসজিদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ভাদুঘর গ্রামে অবস্থিত। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর দপ্তর থেকে প্রায় ৩ কি. মি. দক্ষিণে এই গ্রামটির অবস্থান।

পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলি: সম্পূর্ণ ইটের তৈরী এবং পলেস্তারা আচ্ছাদিত এ মসজিদটির ভূমি পরিকল্পনা বর্গাকার (ভূমি-পরিকল্পনা:৩)। অভ্যন্তরভাগে এর প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য ৬.৫৮ মিটার । বাইরের দিকের চারকোনে রয়েছে চারটি অষ্টকোনাকার পার্শ্ববুরুজ। সবগুলো পার্শ্ববুরুজই বপ্র ছাড়িয়ে উর্ধ্বগামী এবং এগুলোর শীর্ষে রয়েছে ছত্রী এবং ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজ। এগুলো বর্তমানে সংস্কার করা হয়েছে। মসজিদটির পূর্ব দিকের ফাসাদে তিনটি এবং উত্তর এবং দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে খিলানকৃত প্রবেশ পথ রয়েছে। পুর্ব দেয়ালের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি এর দুই পার্শ্বস্থ প্রবেশ পথ দুটির চেয়ে বৃহত্তর। পশ্চিম দেয়ালের ভিতরের অংশে রয়েছে তিনটি অবতল আকৃতির মিহরাব। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর এবং খানিকটা বাইরের দিকে প্রক্ষিপ্ত। এই প্রক্ষেপণের দুই প্রান্তে রয়েছে ক্ষুদ্রাকৃতির মিনার । পূর্ব দিকের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথেও এরকম ক্ষুদ্রাকৃতির মিনার শোভিত প্রক্ষেপণ ছিল, যার চিহ্ন এখনো দৃশ্যমান।

বর্গাকৃতির প্রার্থনা কক্ষের ছাদটি বৃত্তাকার ড্রামের উপর স্থাপিত একটি বৃহৎ অর্ধগোলাকার গম্বুজে আচ্ছাদিত। গম্বুজের শীর্ষে রয়েছে পদ্মকলস শোভিত শীর্ষচূড়া। বর্তমানে অবশ্য এগুলো ভেঙে গিয়ে বিসদৃশ্য রূপ ধারণ করেছে। চার দেয়ালের চারটি বন্ধ খিলান এবং চারকোনে চারটি অর্ধগম্বুজ

Dhaka University Institutional Repository

আকৃতির স্কুইঞ্চ গম্বুজটির ভার বহন করছে। এই বদ্ধ খিলান এবং স্কুইঞ্চ এর মধ্যবর্তী ত্রিকোন অংশগুলো সুলতানী বাংলায় প্রচলিত রীতিতে বাংলা পান্দানতিফ দিয়ে পূরণ করা হয়েছে (আলোকচিত্র : ১১)। মুঘল রীতি অনুযায়ী মসজিদটির বপ্র এবং কর্নিশ সমান্তরাল ভাবে নির্মিত।

অলঙ্করণ : বর্তমানে মসজিদটির বাইরের দেয়াল পুরোপুরি পলেস্তারা আচ্ছাদিত এবং চুনকাম করা। তবে আদিতে দেয়ালগাত্রে যে আয়তাকার এবং বর্গাকার খোপ নকশা ছিল তার চিহ্ন এখনো খুঁজে পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের আয়তকার প্যানেলটির গায়ে রয়েছে সাম্প্রতিককালে সংযোজিত ফুলেল নকশা, গম্বুজের ভেতরের দিকের শীর্ষে পলেস্তারা নির্মিত স্তরীকৃত গোলাপ নকশা রয়েছে।

নির্মাণকাল : কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের উপরে স্থাপিত একটি ফারসি শিলালিপি[৪২] অনুসারে জানা যায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে ১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে জনৈক নুর মুহম্মদ এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।

সংস্কার ও সম্প্রসারণ : ১৯৮০'র দশকে স্থানীয় লোকজনের উদ্যোগে মসজিদটির আমূল সংস্কার করা হয়েছে। মুসল্লীদের স্থান সংকুলানের উদ্দেশ্যে সেই সময়ে এর উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ করা হয়। মসজিদের বর্ধিত অংশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে একটি নতুন মিনারও সংযোজন করা হয়। এই সব সংস্কার ও সম্প্রসারণের ফলে বর্তমানে বাইরে থেকে মসজিদটিকে একটি আধুনিক ইমারত বলে মনে হয়।

সাধারণ আলোচনা : এই মসজিদটি সম্ভবত বাংলায় ক্ষুদ্রাকৃতির মিনার শোভিত প্রক্ষেপণযুক্ত এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের প্রাচীনতম জ্ঞাত নিদর্শন। বাংলায় মুঘল স্থাপত্যের একটি পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিচিত এই

৪২. শিলালিপিটির পূর্ণপাঠ ও অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-১, পৃ. ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্ষেপণের ব্যবহার বগুড়ার শেরপুরে অবস্থিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট খন্দকার টোলা মসজিদে (১৬৩২ খ্রীঃ) সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয়।[৪৩] পরবর্তীতে বাংলার প্রায় সকল মুঘল মসজিদে এই বৈশিষ্টটি অনুকৃত হয়েছে।

৪৩. M.A. Bari, *Mughal Mosque Type in Bangladesh:Origin and Development*, Unpublished Ph.D thesis, IBS, Rajshahi, 1990, pp.134-35

Dhaka University Institutional Repository

আরিফাইল মসজিদ

(ভূমি-পরিকল্পনা-৪; আলোকচিত্র : ১২-১৪)

অবস্থান : আরিফাইল মসজিদ সরাইল থানা সদর দপ্তর থেকে ৫০০ মিটার উত্তর-পশ্চিমে আরিফাইল গ্রামে অবস্থিত।

পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলি : ভূমি থেকে সামান্য উঁচু একটি বাধানো চত্ত্বরের পশ্চিম প্রান্তের অর্ধেক অংশ জুড়ে এই মসজিদটি অবিস্থত (আলোকচিত্র : ১২)। চত্ত্বরের বাকী অর্ধাংশ মসজিদের অঙ্গন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অঙ্গনের চারদিক একটি নিচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, পূর্ব দিকে এই দেওয়ালের মাঝামাঝি স্থানে একটি তোরণ রয়েছে। তবে এই তোরণটিকে সাম্প্রতিক কালের সংযোজন বলেই মনে হয়। মসজিদটির পাশেই রয়েছে একটি বিশাল পুকুর, স্থানীয়ভাবে সেটি সাগরদীঘি নামে পরিচিত।

আয়তাকার মূল মসজিদটির পরিমাপ বাইরে থেকে ২৪.৪ মিটার × ৯.২ মিটার, তবে দেওয়ালগুলো প্রায় ১.৬ মিটার পুরু হওয়ায় ভেতর থেকে এই পরিমাপ দাঁড়িয়েছে ২১.১৮ মিটার × ৬.১ মিটার (ভূমি-পরিকল্পনা : ৪)। মসজিদটির বাইরের দিকের চারকোনে রয়েছে চারটি অষ্টকোন আকৃতির পার্শ্ব বুরুজ, ইমারতের সমান্তরাল প্যারাপেট ছাড়িয়ে সেগুলো উপরে উঠে গেছে এবং এর শীর্ষে রয়েছে কলস নকশার শীর্ষচূড়াযুক্ত খাঁজকাটা ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজ। সবমিলিয়ে ইমারতটিতে রয়েছে পাঁচটি প্রবেশদ্বার — পূর্বদিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে। পূর্বদিকের তিনটি প্রবেশদ্বারের মধ্যে কেন্দ্রীয়টি যথারীতি অপেক্ষাকৃত বড় এবং দেওয়াল থেকে সামান্য বহির্গত একটি প্রক্ষেপণের মধ্যে অবস্থিত। বাইরের দিকে এটি উন্মুক্ত হয়েছে একটি

Dhaka University Institutional Repository

অর্ধগম্বুজ আকৃতির খিলান ছাদ এর নিচে (আলোকচিত্র : ১৩)। অন্যান্য প্রবেশ পথগুলোয় এ রকম অর্ধগম্বুজ নেই। তবে সেগুলোতেও রয়েছে দুটি করে খিলান। বাইরের বড় আকারের খিলান এবং প্রবেশ দ্বারের মূল খিলানটির মধ্যবর্তী অংশ পূরণ করা হয়েছে খিলান ছাদ দিয়েই।

পূর্ব দেওয়ালের তিনটি প্রবেশদ্বারের সমান্তরালে পশ্চিম দেওয়ালে রয়েছে তিনটি অর্ধ অষ্টকোণ আকৃতির মিহরাব (আলোকচিত্র : ১৪)। এখানে অবশ্য তিনটি মিহরাবই সমান আকৃতির। তবে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের মতো কেন্দ্রীয় মিহরাবটিও দেওয়াল থেকে সামান্য বহির্গত একটি প্রক্ষেপণের মধ্যে স্থাপিত। এই দুটি প্রক্ষেপণেরই দুপ্রান্তে রয়েছে ক্ষুদ্রাকৃতির মিনার। সরু, বৃত্তাকার এই মিনারগুলোও ছাদ ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে এবং চারকোনের পার্শ্ববুরুজের মতোই এগুলোর শীর্ষেও রয়েছে অনুরূপ ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজ।

পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত দুটি প্রশস্ত আড়-খিলান মসজিদটির আভ্যন্তরীণ পরিসরকে তিনটি সমান বর্গাকার বে'তে বিভক্ত করেছে। প্রতিটি বে'র উপরে রয়েছে একটি করে গম্বুজ। অষ্টকোন পিপার উপর স্থাপিত এই গম্বুজগুলো সমান আকৃতির এবং এগুলোর শীর্ষে রয়েছে পদ্ম-কলস নকশার শীর্ষচূড়া। অভ্যন্তরে গম্বুজের ভার আড়-খিলানদ্বয় এবং মিহরাব ও প্রবেশ পথগুলোর খিলানের ওপর ন্যস্ত। খিলানগুলোর মধ্যবর্তী অংশ পূরণ করা হয়েছে পেন্ডেনটিভ দিয়ে।

অলঙ্করণ : বর্তমানে মসজিদটি সম্পূর্ণ পলেস্তারা আবৃত এবং চুনকাম করা হয়েছে । তবু এর আদি অলঙ্করণের অনেক চিহ্ন এখনো খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলায় মুঘল স্থাপত্যের অতি পরিচিত রীতি অনুযায়ী মসজিদের পশ্চিম দেওয়াল ব্যতীত বাকী তিন দেওয়ালেরই বাইরের অংশে রয়েছে নিচু আয়তাকার খোপ-নকশা, পূর্ব দেওয়ালে এই খোপগুলোয় আবার আছে খাঁজকাটা খিলানের নকশা। চারকোনের পার্শ্ববুরুজগুলোর গায়ে ছাঁচে ঢালা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যান্ড নকশার সাহায্যে এগুলোকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। মসজিদের বপ্র এবং গম্বুজগুলোর পিপার বাইরের অংশকে ঘিরে রয়েছে বন্ধ পদ্ম-পাঁপড়ি নকশার সারি।

মিহরাবগুলো দেওয়ালের গায়ে সংস্থাপিত আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে স্থাপিত, আর এদের খিলানগুলো বহুখাঁজ বিশিষ্ট। ফ্রেমের উপরের অংশে রয়েছে প্যাঁচালো লতাপাতার নকশা আর এর উপরে দেওয়ালে রয়েছে বন্ধ পদ্ম-পাঁপড়ি নকশার একটি সারি। পূর্ব দেওয়ালের কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বার এবং উত্তর ও দক্ষিণ প্রবেশদ্বারের দুপাশে রয়েছে একটি করে গভীর কুলুঙ্গি। গম্বুজের পিপার নিম্নাংশে রয়েছে পদ্ম-পাঁপড়ি নকশার সারি, আর এগুলোর শীর্ষে রয়েছে গোলাপ নকশা কেন্দ্রীয় মিহরাব ও কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারের অর্ধগম্বুজ ভল্টে রয়েছে পলেস্তারা দিয়ে তৈরী মুকারনাস (জালি নকশা)।

নির্মাণকাল ও সাধারণ আলোচনা : জনশ্রুতি অনুযায়ী এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন শাহ আরিফ নামে একজন সুফি সাধক। মসজিদের পাশেই একটি সমাধিতে শায়িত এই সাধকের নাম অনুসারেই মসজিদটি স্থানীয় লোকজনের কাছে পরিচিত। এই সুফি সাধক কোন যুগে এ অঞ্চলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন কিংবা কবে তার মৃত্যু হয়েছিল এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন ঐতিহাসিক সূত্র থেকে কিছু জানা যায় না। তবে মসজিদটির নির্মাতা যে-ই হোক না কেন, পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলি দেখে ইমারতটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা তার পরবর্তীকালে কখনো নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়। ঢাকার হাজি খাজা শাহবাজের মসজিদ (১৫৭৯) এর সঙ্গে এর পরিকল্পনা ও নির্মাণ শৈলির প্রায় হুবহু মিল রয়েছে।

এক সময় এই মসজিদটি প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে বিপুল অর্থ ব্যয়ে এটি সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। এ ধরনের অপরিকল্পিত সংস্কারের ফলে সাধারণত ইমারতের আদি

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়, তবে এ ক্ষেত্রে সংস্কার সত্ত্বেও সামান্য কিছু পরিবর্তন বাদ দিলে এর আদি বৈশিষ্ট্যের প্রায় সবটুকুই এখনো টিকে আছে। ১৯৮০'র দশকের শেষ দিকে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর মসজিদটিকে সংরক্ষিত হিসেবে ইমারত অধিগ্রহণ করে। তাদের উদ্যোগেও অল্প কিছু সংস্কার করা হয়েছে। এ মসজিদে এখনো নিয়মিত নামাজ পড়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আরিফাইলের সমাধি

(ভূমি-পরিকল্পনা-৫; আলোকচিত্র : ১৫-১৮)

অবস্থান : ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল থানা সদর দপ্তর থেকে ৫০০ মিটার উত্তর-পশ্চিমে আরিফাইল গ্রামে অবস্থিত আরিফাইল মসজিদের দক্ষিণ দিকে সামান্য দূরে আরিফাইলের মুঘল সমাধিটি অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে জোড়-কবর নামেও পরিচিত এই সমাধিতে শায়িত আছেন দুজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি, যাদের মধ্যে একজন সম্ভবত পুরুষ এবং অন্যজন মহিলা।

পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলি : ভূমি পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলির কারণে এই সমাধিটি বাংলা স্থাপত্যের এক বিরল নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়। এটিই বাংলাদেশে নির্মিত দ্বিতল বিশিষ্ট একমাত্র সমাধি ইমারত (আলোকচিত্র : ১৫)।

ভূমি পরিকল্পনায় মূল সমাধি কক্ষটি বর্গাকার এবং দ্বিতল বিশিষ্ট (ভূমি-পরিকল্পনা : ৫)। প্রতি বাহুর দৈর্ঘ বাইরে থেকে ৭.৯২ মিটার। আর এর উত্তর দিকে রয়েছে ২.৫১ মিটার প্রশস্ত আয়তাকার একটি সংলগ্ন বারান্দা। ১.০৬ মিটার প্রশস্ত দেওয়ালসহ এই বারান্দাটির পরিমাপ বাইরে থেকে ৭.৯২ মিটার × ৩.৫৭ মিটার। মূলত গর্ভগৃহ হিসেবে নির্মিত সমাধি কক্ষের নিচতলাটির সমান উচ্চতা বিশিষ্ট একটি উত্তোলিত মঞ্চের ওপর এই বারান্দাটি অবস্থিত। মূল সমাধি কক্ষের ওপর আচ্ছাদন হিসেবে রয়েছে একটি কন্দাকৃতির গম্বুজ, তবে এর সংলগ্ন বারান্দটির ওপরের আচ্ছাদন গ্রামবাংলার কুঁড়েঘরের অনুরূপ দোচালা আকৃতির (আলোকচিত্র : ১৫)।

২ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট গর্ভগৃহটির দক্ষিণ দেয়ালে রয়েছে ১.৮৩ মিটার উচুঁ এবং ১.২২ মিটার প্রশস্ত দুটি খিলানকৃত প্রবেশপথ, তবে এর বাকি তিন দিকই নিরেট দেয়াল দিয়ে ঘেরা। যে কারণে এর অভ্যন্তরভাগ অন্ধকার। এই

Dhaka University Institutional Repository

গর্ভগৃহে অবস্থিত সমাধিদুটির সমান্তরালে ওপরতলার মূল সমাধি কক্ষে রয়েছে দুটি কৃত্রিম শবাধার। এর মধ্যে পশ্চিম দিকের শবাধারটি ডিম্বাকৃতির এবং পূর্বেরটি সমান্তরাল (আলোকচিত্র : ১৭)। এ ধরণের শবাধার যথাক্রমে পুরুষ এবং মহিলার কবরের প্রতীক। এ দুটি শবাধারের পাশে দোচালা আকৃতির একটি বাতিদান রয়েছে (আলোকচিত্র : ১৮)। দ্বিতলের এই সমাধির দক্ষিণ দেয়ালে রয়েছে একটিমাত্র প্রবেশপথ, যদিও সেটিকে প্রবেশপথ না বলে জানালা বলাই সঙ্গত কেননা ওপর তলায় অবস্থিত এই প্রবেশপথে পৌছানোর জন্য কোন সিঁড়ির ব্যবস্থা নেই। পূর্বদিকের বারান্দা থেকেও এই সমাধি কক্ষে প্রবেশের কোন ব্যবস্থা নেই, তবে বারান্দা ও মূল সমাধিকক্ষের মাঝের দেয়ালে আয়তাকার একটি ফোকর রয়েছে।

অলঙ্করণ : সম্পূর্ণ ইট দিয়ে নির্মিত এবং পলেস্তারা আচ্ছাদিত এই সমাধিটিতে অলঙ্করণ রয়েছে খুব সামান্য। বাইরের দেয়ালের গায়ে রয়েছে মুঘল স্থাপত্যের অতি পরিচিত আয়তাকার খোপ নকশা, আর এর চারকোণের পার্শ্ববুরুজ ও গম্বুজের শীর্ষে রয়েছে পদ্ম-কলস নকশাশোভিত শীর্ষচুড়া।

নির্মাণকাল ও সাধারণ আলোচনা : এই সমাধিতে কিংবা পাশ্ববর্তী মসজিদটিতে কোন শিলালিপি না থাকায় এর নির্মাণকাল কিংবা এখানে শায়িত আছেন কারা তা সঠিকভাবে জানা যায় না। বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধে হাবিবা খাতুন প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এ সমাধির নির্মাণকাল ১৬২০-৩০ সালের মধ্যে এবং এখানে শায়িত আছেন দুজন মুঘল সেনাপতি সৈয়দ হাফিজ মোহাম্মদ খান ও আহমদ খান।[৪৪] তার যুক্তি - সুবাহদার ইসলাম খান মাশহাদি (১৬১০-২৭) কিংবা আরো সম্ভাব্য তার উত্তরাধিকারী ফিদাই খানের সময়ে (১৬২৭) মুঘলদের হয়ে যুদ্ধের পুরস্কার

---

৪৪. 'The tomb at Arifail in Comilla District', *Journal of the Varendra Research Museum,* vol. 7, Rajshahi,1985, p 186

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে সৈয়দ মোহাম্মদ খান সরাইলের 'নওয়ারা' জমিদারি লাভ করেন এবং তিনিই এই সমাধি ও মসজিদ নির্মাণ করেন। শিলালিপি- বিশিষ্ট নিকটবর্তী সরাইল মসজিদের সঙ্গে স্থাপত্যিক বৈশিষ্টের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে হাবিবা খাতুন এই তারিখ নির্ণয় করেছেন তবে সরাইল মসজিদের শিলালিপিতে উল্লেখিত তারিখটি তিনি ভুল পাঠ করেছেন বলে এই মত গ্রহণযোগ্য নয়।[৪৫] এ অঞ্চলে প্রচলিত জনশ্রুতির ভিত্তিতে এটিকে শাহ আরিফ নামে জনৈক সুফি সাধক এবং তার স্ত্রীর সমাধি বলে মনে করা হয়। এ মতটিই বরং গ্রহণযোগ্য, এবং স্থাপত্যিক বৈশিষ্টের আলোকে এর নির্মাণ কাল সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে বলে প্রতীয়মান হয়।

এই স্থাপত্যিক বৈশিষ্টের কারণেই সমাধিটি বাংলা স্থাপত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান দাবি করতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এটি বাংলায় নির্মিত দ্বিতলবিশিষ্ট এবং কৃত্রিম সমাধি প্রস্তর সম্বলিত একমাত্র সমাধি। সমাধি স্থাপত্যে এ ধরণের ব্যবস্থাপনা অবশ্য মোটেই নতুন নয়, ভারতবর্ষে মুসলিম সমাধি স্থাপত্যের সূচনালগ্নের নিদর্শন সুলতান ঘারিতেই এ ধারণার ব্যবহার হয়েছিল।[৪৬] আর মুঘল রাজকীয় স্থাপত্যে তো এটা ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। হুমায়ুনের সমাধি কিংবা তাজমহলের মতো বেশিরভাগ মুঘল সমাধিতেই এই ভূ-গর্ভস্থ সমাধিকক্ষের ব্যবহার হয়েছে। চাহারবাগ বাগানবেষ্টিত পরিবেশে নির্মিত বিশাল অবয়বের এ সব রাজকীয় স্থাপত্যের সঙ্গে অবশ্য আলোচ্য সমাধিটি তুলনীয় নয়। তবে এটি একেবারে বিচ্ছিন্ন সমাধিও নয়। এর ঠিক পাশেই অবস্থিত বিশাল আয়তনের আরিফাইল মসজিদটি। বাংলার মুঘল সমাধি স্থাপত্যের ইতিহাসে সমাধি ও মসজিদের এ

---

৪৫. তিনি ভুলক্রমে সরাইল মসজিদের নির্মাণকাল ১০২৫ হিজরি (১৬১৫ খ্রিস্টাব্দ) বলে উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য, Khatun, Habiba, *Op. Cit.*, p 186| প্রকৃত পক্ষে তা হবে ১০৭৪ হিজরি (১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ)।

৪৬. Nath, R., *History of Sultanate Architectute*, Delhi, 1978, p 79

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের সহাবস্থান অভিনব নয়। গৌড়ের শাহ নিয়ামতউল্লাহ ওয়ালির সমাধি (সপ্তদশ শতক), ঢাকার হাজি খাজা শাহবাজের সমাধি (১৬৭৯), খাজা আনোয়ারের সমাধি (সপ্তদশ শতকের শেষভাগ) এবং আরো পরে নির্মিত মুর্শিদাবাদের আজিমুন্নিসা বেগমের সমাধি (১৭৩৪), নবাব সুজাউদ্দিনের সমাধি (১৭৩৮-৩৯) ও বদর নিসা বেগমের সমাধি (১৮৪০) প্রভৃতিও নির্মিত হয়েছে সংলগ্ন মসজিদসহ। এর মধ্যে হাজি খাজা শাহবাজের সমাধির সঙ্গেই আলোচ্য আরিফাইলের সমাধির মিল সবচেয়ে বেশি। ঢাকার সমাধিটিতেও এক সময় গ্রাম বাংলার কুঁড়েঘরের অনুরূপ দো-চালা ভল্টে আচ্ছাদিত সংলগ্ন একটি বারান্দা ছিল, বর্তমানে যার চিহ্ন আর দেখা যায় না।[৪৭] এ রকম দোচালার ব্যবহার আরো দেখা যায় খাজা আনোয়ারের সমাধিতেও, তবে সেখানে শুধু একদিকে নয়, মূল সমাধির উভয় দিকেই দুটি দোচালা আচ্ছাদিত সংলগ্ন কক্ষ রয়েছে। এ সব বৈশিষ্টের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় আরিফাইলের মুঘল সমাধিটি সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে কিংবা তার পরে কখনো নির্মিত হয়েছিল।

৪৭. Asher, C. B., 'Inventory to the key monuments', in *Islamic Heritage of Bengal*, edited by G. Michell, Paris, 1984, p. 80

Dhaka University Institutional Repository

বড় শরীফপুর মসজিদ

(ভূমি-পরিকল্পনা-৬; আলোকচিত্র : ১৯-২০)

অবস্থান : বড় শরীফপুর মসজিদ কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার বড় শরীফপুর গ্রামে নটেশ্বর দীঘি নামে পরিচিত একটি বিশাল দীঘির পূর্বতীরে অবস্থিত। লাকসাম থানা সদর থেকে প্রায় ২৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত চিতসী বাজারের নিকটে এই প্রত্যন্ত গ্রামটির অবস্থান। মসজিদটি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত (আলোকচিত্র-১৯)।

পরিকল্পনা ও নির্মাণ শৈলি : পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি প্রবেশ তোরণ পেরিয়ে নিচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদে প্রবেশ করতে হয়। চারকোনে চারটি বিশাল অষ্টকোনাকার পার্শ্ববুরুজবিশিষ্ট আয়তাকার মূল মসজিদটির পরিমাপ বাইরের দিক থেকে ১৪.৪৮ মিটার থ ৫.৯৪ মিটার (ভূমি-পরিকল্পনা : ৬)। পার্শ্ববুরুজগুলো ছাদ ছাড়িয়ে উর্ধ্বগামী। এগুলোর মধ্যে সামনের দুটির শীর্ষে রয়েছে পদ্মকলস নকশার ফিনিয়াল শোভিত ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজ। তবে পিছনের দুটির শীর্ষে রয়েছে ত্রিকোনাকৃতির চুড়া। মসজিদের তিনটি গম্বুজের মধ্যে কেন্দ্রীয় গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর। অষ্টাকোনাকার ড্রামের ওপর স্থাপিত এই গম্বুজগুলোর শীর্ষে রয়েছে পদ্ম কলস শোভিত ফিনিয়াল।

মসজিদের কিবলা কোঠায় প্রবেশের জন্য রয়েছে মোট পাঁচটি খিলানকৃত প্রবেশ পথ -পূর্ব দিকের ফাসাদে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে। শেষোক্ত দুটি প্রবেশপথ অবশ্য লোহার তৈরী জালি দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পূর্ব দিকের প্রবেশ পথগুলো অর্ধগম্বুজ আচ্ছাদিত ভল্টের নিচে উন্মুক্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর এবং এটি দেয়াল থেকে

Dhaka University Institutional Repository

বহির্গত একটি প্রক্ষেপণের মধ্যে স্থাপিত। এই প্রক্ষেপণের দুই প্রান্তে রয়েছে অষ্টকোনাকার ক্ষুদ্রাকৃতির মিনার । পূর্ব দিকের প্রবেশ পথ বরাবর পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে তিনটি অষ্টকোনাকার মিহরাব। প্রতিসাম্য বজায় রাখার জন্য এখানেও কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অন্য দুটি অপেক্ষা বৃহত্তর এবং খানিকটা বাইরের দিকে প্রক্ষিপ্ত।

দেয়ালের গায়ে সংলগ্ন ইটের তৈরী স্তম্ভের ওপর থেকে আড়াআড়িভাবে নির্মিত দুটি প্রশস্ত খিলান মসজিদের অভ্যন্তরভাগকে তিনটি বে'তে বিভক্ত করেছে। এর মধ্যবর্তী বে'টি বর্গাকার এবং দুপাশের দুটি আয়তাকার। তিনটি বে'র উপরেই আচ্ছাদন হিসাবে রয়েছে সামান্য কন্দাকৃতির গম্বুজ। গম্বুজ গুলোর ভার বহনের জন্য অবস্থান্তর পর্যায়ে লালবাগ দুর্গের মসজিদ এবং ঢাকার সাতগম্বুজ মসজিদের মতো পেন্ডেনটিভ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

অলঙ্করণ : মসজিদের পূর্ব দিকের ফাসাদটি খিলানকৃত গভীর খোপ নকশার সাহায্যে চমৎকারভাবে অলঙ্কৃত। সমান্তরাল বপ্র এবং তার ওপরে গম্বুজের নিম্নাংশের অষ্টকোন ড্রাম বন্ধ পদ্মপাঁপড়ি নকশা দিয়ে অলঙ্কৃত। ছাঁচে ঢালা ব্যান্ড নকশার সাহায্যে কয়েকটি অংশে বিভক্ত অষ্টকোনাকার পার্শ্ববুরুজ সমূহের ভিত্তিতে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন কলস নকশা, মিহরাবত্রয়ের খিলানগুলোর বাইরের দিক বহুখাঁজ বিশিষ্ট।

পুরো মসজিদটির ভিতরের অংশ বর্তমানে পলেস্তারা আচ্ছাদিত এবং চুনকাম করা। কেন্দ্রীয় মিহরাবের আয়তাকার ফ্রেমের ওপরে রয়েছে বন্ধ পদ্মপাপড়ি নকশার একটি সারি। গম্বুজের ভেতরের দিকে নিম্নাংশ ঘিরে রয়েছে পাতার নকশা। আর এর শীর্ষে রয়েছে বৃহদাকার চক্র নকশা।

নির্মাণকাল ও সাধারণ আলোচনা : একটি বড় গম্বুজ এবং তার দুই পাশে দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট গম্বুজবিশিষ্ট এই পরিকল্পনা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট অনুযায়ী এই মসজিদটি মুঘল বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের অতি পরিচিত রূপটিই তুলে

Dhaka University Institutional Repository

ধরেছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের উপর একটি এবং কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপর স্থাপিত আরেকটি ফারসি শিলালিপি অনুসারে জনৈক মুহম্মদ হায়াত আবদ করিম ১৭০৬-১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেন।[৪৮] কিংবদন্তী অনুসারে তিনি ছিলেন এই এলাকার একজন কোতোয়াল। মসজিদটি তাই স্থানীয়ভাবে কোতোয়ালী মসজিদ নামেও পরিচিত।

১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে মসজিদটিকে সংরক্ষিত ইমারত হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৬০'র দশকের গোড়ার দিকে এর কিছুটা সংস্কার করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক মসজিদটির আরো সংস্কার করা হয়। অলঙ্কৃত খোপ নকশা সমূহের আদিরূপ ফিরিয়ে আনার জন্য এ সময়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিলো ।

৪৮. শিলালিপিটির পূর্ণপাঠ ও অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-১, পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

উলচাপাড়া মসজিদ

(ভূমি-পরিকল্পনা-৭ ; আলোকচিত্র : ২১-২২)

অবস্থান: উলচাপাড়া মসজিদটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত উলচাপাড়া গ্রামে অবস্থিত। জেলা সদর থেকে ৩ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে এই গ্রামটির অবস্থান।

পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলি: মাটি থেকে উঁচু বর্গাকার (প্রতি বাহুর দৈর্ঘ ১২.৮ মিটার) একটি বাঁধানো ভিত্তিমঞ্চের উপর তিন গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। এই ভিত্তিমঞ্চটিকে তিনদিক থেকে ঘিরে রেখেছে প্রায় তিন ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট নিচু বেষ্টনী প্রাচীর। প্রাচীরের পূর্ব দিকে মাঝামাঝি স্থানে একটি প্রবেশ তোরণ রয়েছে (আলোকচিত্র-২২)। মূল মসজিদের কেন্দ্রিয় প্রবেশ পথের ঠিক সমান্তরালে স্থাপিত এই তোরণটি মূলত একটি একক চতুর্কেন্দ্রিক খিলান। এর দক্ষিণ দিকে বেষ্টনী প্রাচীরের ওপর থেকে নির্মিত কয়েক ধাপ বিশিষ্ট সিড়ি পথের সাহায্যে তোরণটির শীর্ষে উঠা যায়। এই ব্যবস্থা দেখে মনে হয় এক সময় আজান দেয়ার উদ্দেশ্যে তোরণ-শীর্ষের স্থানটুকু ব্যবহৃত হতো।

চত্বরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মসজিদের কিবলা-কোঠাটির পরিকল্পনা আয়তাকার (ভূমি-পরিকল্পনা : ৭)। বাইরে থেকে এর পরিমাপ ১২.৮ মিটার × ৬.৭ মিটার এবং অভ্যন্তরভাগে এই পরিমাপ ১০.২ মিটার × ৪.১ মিটার। দেয়ালের পুরুত্ব ১.২ মিটার। মসজিদের বাইরের দিকে চারকোনে রয়েছে চারটি অষ্টকোনাকার পার্শ্ববুরুজ। বুরুজগুলো বপ্র ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে এবং এগুলোর শীর্ষে রয়েছে পদ্ম-কলস নকশার শীর্ষচুড়া শোভিত খাঁজকাটা নিরেট ছত্রী।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদটিতে প্রবেশের জন্য পূর্ব দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে প্রবেশ পথ রয়েছে। পূর্ব দিকের প্রবেশপথ গুলো প্রতিটিই একটি করে অর্ধগম্বুজের নিচে উন্মুক্ত হয়েছে। এগুলোর প্রতিটিতে রয়েছে দুটি করে খিলান। বাইরের বড় খিলানগুলো বহুখাঁজবিশিষ্ট এবং তার ভেতরে অর্ধগম্বুজের নিচে ক্ষুদ্রাকৃতির খিলানগুলো সাধারণ চতুর্কেন্দ্রিক আকৃতির খিলান। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে এটির আকার আয়তন পাশ্ববর্তী প্রবেশ পথদুটির তুলনায় বড় রাখা হয়েছে এবং দেয়াল থেকে সামান্য বহির্গত একটি প্রক্ষেপণের মধ্যে এটিকে স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রক্ষেপণের দুই প্রান্তে রয়েছে দুটি সরু আলঙ্কারিক মিনার।

পূর্ব দেয়ালের তিনটি প্রবেশ পথের সমান্তরালে পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে তিনটি অবতল অর্ধ অষ্টকোনাকার মিহরাব। এর মধ্যে কেন্দ্রিয়টি অপেক্ষাকৃত বড়, এবং কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের মতোই এটিও দুপ্রান্তে আলঙ্কারিক মিনারশোভিত একটি আয়তাকার প্রক্ষেপণের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে। চারকোনের পার্শ্ববুরুজ সমূহের মতো এই আলঙ্কারিক মিনারগুলোও ছাদ ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে এবং এগুলোর শীর্ষে রয়েছে কলস নকশার ফিনিয়াল শোভিত ছোট ছোট খাঁজকাটা গম্বুজ। ঐতিহ্যবাহী যুগল রীতিতে মসজিদটির কর্নিশ এবং বপ্র সমান্তরাল।

মসজিদের অভ্যন্তরভাগ তিনটি অসমান বেতে বিভক্ত। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় বেটি পাশের দুটি অপেক্ষা বড় এবং বর্গাকার। এর প্রতিবাহুর দৈর্ঘ ৪.২৭ মিটার। আর এর দুপাশের দুটি বে আয়তাকার, পরিমাপ ৪.২৭ মিটার × ২.২ মিটার। প্রতিটি বের উপরেই রয়েছে একটি করে কন্দাকৃতির গম্বুজ। গম্বুজগুলো অষ্টাকোনাকার পিপার উপরে স্থাপিত। কেন্দ্রীয় বে'র উপরের গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বড় — কেন্দ্রীয় মিহরাব ও প্রবেশ পথের উপরের দুটি

Dhaka University Institutional Repository

খিলান এবং মসজিদ অভ্যন্তরে আড়াআড়িভাবে নির্মিত দুটি প্রশস্ত খিলান এই গম্বুজটির ভার বহন করছে। আর খিলানের মধ্যবর্তী কোনগুলো পূরণ করা হয়েছে মুঘল রীতির ত্রিকোন পেন্ডেনটিভ দিয়ে। দুপাশের ছোট দুটি গম্বুজ নির্মাণে একটি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে — পূর্ব ও পশ্চিম দেওয়ালে একটি করে অর্ধগম্বুজ ভল্ট নির্মাণ করে প্রথমে আয়তাকার বে গুলোর পরিসর বর্গে রূপান্তরিত করা হয়েছে, তারপর এই বর্গাকার অংশের উপর নির্মিত হয়েছে গম্বুজ। সবকটি গম্বুজেরই শীর্ষে রয়েছে পদ্ম-কলস নকশার সুদৃশ্য ফিনিয়াল।

অলঙ্করণঃ সম্পূর্ণ পলেস্তারা আবৃত এই মসজিদটির অলঙ্করণ মূলত পলেস্তারা দিয়েই করা হয়েছে। পশ্চিম দেওয়াল ব্যতীত বাকী তিনদিকেরই দেওয়ালের বাইরের অংশ ঐতিহ্যবাহী মুঘল রীতির খিলানযুক্ত খোপ নকশা দিয়ে অলঙ্কৃত। বপ্র এবং গম্বুজের পিপাকে ঘিরে রয়েছে বন্ধ পদ্ম-পাঁপড়ির নকশা। চারকোনের পার্শ্ববুরুজগুলোকে উঁচু সমান্তরাল ব্যান্ড নকশার সাহায্যে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় মিহরাব আর প্রবেশপথগুলো স্থাপিত হয়েছে একটি করে আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে, আর এই ফ্রেমের উপরে রয়েছে শিখর-নকশার একটি করে সারি।

নির্মাণকালঃ কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের উপরে স্থাপিত একটি ফারসি শিলালিপি[৪৯] অনুসারে এই মসজিদটি ১১৪৩ হিজরিতে (১৭৩০-৩১খ্রিস্টাব্দ) জনৈক মোহাম্মদ মুরাদ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।

বর্তমান অবস্থাঃ এই মসজিদটি এক সময়ে জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। স্থানীয় জনসাধারণ এটিকে সংস্কার করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলে। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এটিকে ১৯৭৬ সালে সংরক্ষিত ইমারত হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৮০ এবং '৯০ এর দশকে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের

---

৪৯. এই শিলালিপিটির পূর্ণ পাঠ ও অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-১,পৃ ১৩০

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধানে অল্প কিছু সংস্কারের মাধ্যমে মসজিদটির আদি বৈশিষ্ট্য অনেকটাই ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। তবে সম্প্রতি স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে মসজিদটির উন্মুক্ত অংগনে একটি টিনের চালাছাদ নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে এখন আর বাইরে থেকে মসজিদটির ফাসাদের সৌন্দর্য দৃশ্যমান নয়।

Dhaka University Institutional Repository

আশরাফপুর সদর গাজী জামে মসজিদ

(ভূমি-পরিকল্পনা-৮; আলোকচিত্র : ২৩-২৫)

অবস্থান: কুমিল্লা শহর থেকে ২ কিলোমিটার দক্ষিণে, লাকসাম-কুমিল্লা সড়কের পশ্চিম দিকে কুমিল্লা পৌরসভার অন্তর্গত আশরাফপুর গ্রামে স্থানীয়ভাবে সদর গাজী জামে মসজিদ নামে পরিচিত এই মসজিদটি অবস্থিত।

পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলি : তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটি একটি নিচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। বর্তমানে সেটি ভেঙ্গে মসজিদের সম্প্রসারণের কাজ চলছে। এই বেষ্টনী প্রাচীরের পূর্ব বাহুর কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত তোরণটিও সম্প্রতি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে (আলোকচিত্র-২৩)।

প্রাচীর ঘেরা এই অঙ্গনের পশ্চিমে একটি বাধানো চত্বরের ওপর অবস্থিত মূল কিবলাকোঠাটি অবস্থিত। এর পরিকল্পনা আয়তাকার, বাইরে থেকে পরিমাপ ২০.১১ মিটার × ৭.৯২ মিটার (ভূমি-পরিকল্পনা : ৮)। কিবলা কোঠার সামনের চত্বরটি আরো ৯.১৫ মিটার বিস্তৃত। বর্তমানে এটির উপর একটি সমতল আচ্ছাদন রয়েছে, তবে আদিতে এটি উন্মুক্ত ছিল বলেই মনে হয়। কিবলাকোঠার চারকোনে রয়েছে চারটি বিশাল অষ্টকোনাকার পার্শ্ববুরুজ। বুরুজগুলো ছাদ ছাড়িয়ে উর্ধ্বগামী। এগুলোর শীর্ষে রয়েছে পদ্মকলস নকশার ফিনিয়াল শোভিত ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজ।

মসজিদের কিবলা কোঠায় প্রবেশের জন্য পূর্ব দিকের ফাসাদে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে খিলানকৃত প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পূর্ব দিকের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর এবং এটি দেয়াল থেকে বহির্গত একটি প্রক্ষেপণের মধ্যে স্থাপিত। পূর্ব দিকের প্রবেশ পথ বরাবর পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে তিনটি অষ্টকোনাকার মিহরাব। প্রতিসাম্য বজায়

Dhaka University Institutional Repository

রাখার জন্য এখানেও কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অন্য দুটি অপেক্ষা বৃহত্তর এবং খানিকটা বাইরের দিকে প্রক্ষিপ্ত। এই প্রক্ষেপণের দুই প্রান্তে রয়েছে সরু অলঙ্কারিক মিনার। চারকোনের পার্শ্ববুরুজগুলোর মতো এগুলোও ছাদ ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে এবং এগুলোর শীর্ষে রয়েছে পদ্ম-কলস নকশার ফিনিয়াল।

দেয়ালের গায়ে সংলগ্ন ইটের তৈরী স্তম্ভের ওপর থেকে আড়াআড়িভাবে নির্মিত দুটি প্রশস্ত খিলান মসজিদের অভ্যন্তরভাগকে তিনটি বে'তে বিভক্ত করেছে। এর মধ্যবর্তী বে'টি বর্গাকার (প্রতি বাহুর পরিমাপ ৫.৪৮ মিটার) এবং দুপাশের দুটি আয়তাকার (পরিমাপ ৫.৪৮ মিটার × ৪.৮৮ মিটার)। তিনটি বে'র উপরেই আচ্ছাদন হিসাবে রয়েছে সামান্য কন্দাকৃতির গম্বুজ ।

অলঙ্করণ : সম্পূর্ণ পলেস্তারা আচ্ছাদিত এই মসজিদের পিছনের দেওয়াল ছাড়া অন্য তিনদিকেই বাইরের দেওয়াল গভীর খোপ নকশার সাহায্যে চমৎকারভাবে অলঙ্কৃত। সমান্তরাল বপ্র এবং তার ওপরে গম্বুজের নিম্নাংশের অষ্টকোন ড্রামও বন্ধ পদ্মপাঁপড়ি নকশা দিয়ে অলঙ্কৃত (আলোকচিত্র-২৪)।। অষ্টকোনাকার পার্শ্ববুরুজগুলো ছাঁচে ঢালা ব্যান্ড নকশার সাহায্যে কয়েকটি অংশে বিভক্ত । এ ছাড়া ভিতরের দিকে গম্বুজের শীর্ষে রয়েছে ফুটন্ত পদ্ম ফুলের নকশা। মসজিদ অভ্যন্তরে তেমন কোন অলঙ্করণ এখন অবশিষ্ট নেই। তবে কেন্দ্রীয় মিহরাবের খিলানটি নয়পাঁপড়িবিশিষ্ট খাঁজকাটা আকৃতির (আলোকচিত্র-২৫)।

নির্মাণকাল ও সাধারণ আলোচনা : কোন শিলালিপি না থাকায় মসজিদটির নির্মাণকাল সঠিক জানা যায় না। এ অঞ্চলে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্ব কালে (১৬৫৯-১৭০৭) সদর গাজী নামে জনৈক বুজর্গ ব্যক্তি এটি নির্মাণ করেন। এই সদর গাজীর প্রকৃত পরিচয় কোন সূত্রে পাওয়া যায় না তবে জীর্ণপ্রায় এ মসজিদটির পরিকল্পনা, নির্মাণশৈলি ও অলঙ্করণ কুমিল্লার অন্যান্য মুঘল মসজিদ বিশেষ করে এই

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ থেকে মাত্র ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শাহ সুজা মসজিদের[৫০] সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় এই জনশ্রুতি সত্যি হওয়া বিচিত্র নয়। মসজিদটির মেঝে পর্যন্ত বর্তমানে মাটির নিচে দেবে গেছে এবং স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে এটির সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশের অন্য অনেক পূরাকীর্তির মতই এটির সংস্কারের উদ্যোগও প্রকৃতপক্ষে এর আদিরূপ মুছে দেওয়ারই উদ্যোগে পর্যবসিত হচ্ছে।

---

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ালিপুর আলমগীরি মসজিদ

(ভূমি-পরিকল্পনা-৯; আলোকচিত্র : ২৬-২৮)

অবস্থান : বর্তমান চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জ থানা সদর থেকে আনুমানিক ১৭ কিলোমিটার পশ্চিমে ওয়ালিপুর গ্রামে শাহী মসজিদ নামে পরিচিত পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট এই মুঘল মসজিদটি অবস্থিত (আলোকচিত্র : ২৬)। ঢাকা-চাঁদপুর মহাসড়কের কৈয়ারপুল নামক স্থান থেকে নয়নপুর ঘাটগামী সড়ক ধরে এই গ্রামে পৌছানো যায়। এই মসজিদের পাশেই তিনগম্বুজবিশিষ্ট আরেকটি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। স্থানীয়ভাবে সেটি সুজা মসজিদ নামে পরিচিত।

পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলি: মসজিদটি পরিকল্পনায় আয়তাকার (ভূমি-পরিকল্পনা-৯) । বাইরে থেকে এর পরিমাপ উত্তর দক্ষিণে ১৫.৩২ মিটার এবং পূর্ব পশ্চিমে ৮.৩ মিটার। দেওয়ালগুলো প্রায় ১.২ মিটার পুরু বলে অভ্যন্তর ভাগে ইমারতটির পরিমাপ দাড়িয়েছে ১২.৯২ মিটার থ ৫.৯ মিটার। মসজিদে প্রবেশের জন্য রয়েছে খিলানের সাহায্যে নির্মিত মোট ৭ টি প্রবেশপথ। এর মধ্যে পূর্ব দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে রয়েছে ২টি করে প্রবেশ পথ। পূর্ব দেয়ালের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি এর দুই পার্শ্বস্থ দুটি প্রবেশপথ অপেক্ষা প্রশস্ততর। দুপাশে আলঙ্কারিক মিনারবেষ্টিত পিস্তাক এর অনুরূপ একটি প্রক্ষেপণের মধ্যে অবস্থিত এই প্রবেশপথটি উন্মুক্ত হয়েছে একটি অর্ধগম্বুজের নিচে। এর দুপাশের প্রবেশপথ দুটিও এরকমই অর্ধ গম্বুজের নিচে উন্মুক্ত, তবে এগুলোয় কোন প্রক্ষেপণ নেই। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের প্রবেশপথগুলো খিলানের সাহায্যে নির্মিত একটি প্যানেলের মধ্যে অবস্থিত, এগুলোয় অর্ধগম্বুজ ব্যবহৃত হয়নি।

পূর্ব দেয়ালের তিনটি প্রবেশ পথের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে তিনটি মিহরাব। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং অর্ধ

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টকোনাকার। তবে দুপাশের মিহরাবগুলোর অগভীর ও আয়তাকার। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটির মতোই কেন্দ্রীয় মিহরাবটিও একটি আয়তাকার প্রক্ষেপণের মধ্যে স্থাপিত এবং এই প্রক্ষেপণের দুই প্রান্তে রয়েছে আলঙ্কারিক মিনার। মিনারগুলো ছাদ ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে। এগুলোর শীর্ষে রয়েছে কলস নকশার শীর্ষচুড়ায়ুক্ত খাঁজকাটা ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজ।

মসজিদ অভ্যন্তরে অবস্থিত দুটি বিশাল আকৃতির অষ্টকোনাকার অনুচ্চ স্তম্ভের সাহায্যে মসজিদের অভ্যন্তরভাগকে পাঁচটি অসমান বর্গাকার বে'তে বিভক্ত করা হয়েছে (আলোকচিত্র : ২৭)। এই স্তম্ভগুলো এবং দেয়ালের গায়ে সংযুক্ত অর্ধ-অষ্টকোন সংলগ্ন স্তম্ভের ওপর থেকে পূর্ব-পশ্চিমে আড়াআড়িভাবে নির্মিত দুটি করে খিলানের সাহায্যে প্রথমে মসজিদ অভ্যন্তরকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় অংশটি বর্গাকার এবং দুপাশের দুটি আয়তাকার। এছাড়া স্তম্ভগুলোর ওপর থেকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত আরো দুটি খিলানের সাহায্যে এর দুপাশের আয়তাকার অংশদুটির প্রতিটিকে দুটি করে ছোট বর্গাকার অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। এই প্রতিটি বর্গের ওপরে আচ্ছাদন হিসেবে রয়েছে একটি করে গম্বুজ। গম্বুজ নির্মাণে স্কুইঞ্চ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে (আলোকচিত্র : ২৮)।

মসজিদটির বাইরের দিকে চার কোনে চারটি অষ্টকোন পার্শ্ববুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলো বপ্র ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে। এগুলোর শীর্ষেও রয়েছে কলস নকশা শোভিত শীর্ষচুড়ায়ুক্ত ছত্রী।

অলঙ্করণঃ ওয়ালিপুর মসজিদের অলঙ্করণে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে পলেস্তারা। গম্বুজ এবং দেওয়ালগুলো পলেস্তারা দিয়ে আবৃত, বর্তমানে এগুলোর ওপর চুনকাম করা হয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকের ফাসাদটি খিলানকৃত গভীর খোপ নকশার সাহায্যে চমৎকারভাবে অলঙ্কৃত। সমান্তরাল বপ্র এবং তার ওপরে গম্বুজের নিম্নাংশের অষ্টকোন ড্রাম বন্ধ পদ্মপাঁপড়ি নকশা

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে অলঙ্কৃত। ছাঁচে ঢালা ব্যান্ড নকশার সাহায্যে কয়েকটি অংশে বিভক্ত অষ্টকোনাকার পার্শ্ববুরুজ সমূহের ভিত্তিতে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন কলস নকশা, মিহরাবত্রয়ের খিলানগুলোর বাইরের দিক বহুখাঁজ বিশিষ্ট।

পুরো মসজিদটির ভিতরের অংশ বর্তমানে পলেস্তারা আচ্ছাদিত এবং চুনকাম করা। কেন্দ্রীয় মিহরাবের আয়তাকার ফ্রেমের ওপরে রয়েছে বন্ধ পদ্মপাপড়ি নকশার একটি সারি। গম্বুজের ভেতরের দিকে নিম্নাংশ ঘিরে রয়েছে পাতার নকশা। আর এর শীর্ষে রয়েছে বৃহদাকার চক্র নকশা।

নির্মাণকাল : কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের ওপরে স্থাপিত একটি ফারসি শিলালিপি অনুসারে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব এর রাজত্বকালে ১১০৪ হিজরি সালে (১৬৯২ খ্রিস্টাব্দে) জনৈক আব্দুল্লাহ এই মসজিদটি নির্মাণ করেছেন।[৫১]

বর্তমান অবস্থা : মসজিদটি এখনো বেশ ভালো অবস্থায় টিকে রয়েছে এবং এটি এখনো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়া মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত ইমারত হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে।

সাধারণ আলোচনা : কেন্দ্রে একটি বড় গম্বুজ এবং চারকোনে চারটি ক্ষুদ্রাকার গম্বুজ বিশিষ্ট এই পরিকল্পনা বাংলায় প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল — অষ্টগ্রামের কুতুবশাহী মসজিদে।[৫২] এই মসজিদটির নির্মাণকাল আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, তবে তখন পর্যন্ত সেখানে মুঘল আধিপত্য বিস্তৃত হয়নি। মুঘল স্থাপত্যে এ পরিকল্পনার প্রয়োগ প্রথম লক্ষ্য করা যায় এ অঞ্চলেরই অন্য একটি মসজিদ সরাইল মসজিদে। মসজিদ পরিকল্পনার এই রূপটি অবশ্য বাংলার কারিগরদের নিজস্ব উদ্ভাবন নয় — সম্ভবত উত্তর ভারত থেকে আমদানি করা হয়েছে এই পরিকল্পনা। দিল্লীর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার

---

৫১. Hussain, A., `Alamgiri Mosque at Walipur', *The Concept of Pakistan,* November, 1965, pp. 26-27

৫২. Bari M.A., 'A Unique Variety of Mughal Mosque', *JBA*, Vol. 2, 1999, p.

Dhaka University Institutional Repository

দরগাহে অবস্থিত জামাত খানা মসজিদ (আনুমানিক ১৩১০-১৬ খ্রি)।[৫৩] ও বিহারের পাটনায় অবস্থিত শের শাহের মসজিদ (আনুমানিক ১৫৪০ খ্রি)[৫৪] প্রভৃতি ইমারতে অনেক আগেই এই পরিকল্পনার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

৫৩. R. Nath, *History of Sultanate Architecture*, New Delhi, 1978, p.49
৫৪. *Ibid*, p. 89

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

উপসংহার

স্থাপত্য মানুষের সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার মধ্য দিয়ে সমকালের মানুষের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, এবং প্রশাসন ব্যবস্থার চিত্র প্রতিফলিত হয়। বর্তমান গবেষণায় আমরা কুমিল্লা অঞ্চলে মুঘল যুগের নিদর্শন হিসেবে টিকে থাকা যে স্থাপত্য কীর্তিগুলোকে খুঁজে পেয়েছি তার মধ্য দিয়েও সমকালীন কুমিল্লার একটি চিত্রই আবিস্কৃত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে কুমিল্লা অঞ্চলে মুঘল যুগের নিদর্শনবাহী কোন ঐহিক স্থাপত্য আবিস্কৃত হয়নি। বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত স্থাপত্য সমূহের মধ্যে রয়েছে কেবল মসজিদ ও সমাধি। এর মধ্যেও মসজিদের সংখ্যাই বেশি। শিলালিপির সাক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট তারিখ বিশিষ্ট পাঁচটি এবং শিলালিপিবিহীন আরো তিনটি মসজিদ আমরা পেয়েছি যেগুলো উল্লিখিত সময়েই নির্মিত হয়েছিল। ভূমি পরিকল্পনার ভিত্তিতে এগুলোকে তিনটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

ক) একগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ

খ) তিনগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ

গ) পাঁচগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ

তবে স্থাপত্যিক বৈশিষ্টে এই মসজিদগুলোর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য চিহ্নিত করা যায় না। শিলালিপিতে প্রাপ্ত তারিখ অনুযায়ী এই মসজিদগুলোর মধ্যে চারটিই মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে (১৬৫৮-১৭০৭) নির্মিত। এগুলোর মধ্যে সর্বপ্রাচীন সরাইল মসজিদের নির্মাণকাল হিজরি ১০৭৪ সাল, অর্থাৎ ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ। অথচ মুঘলদের রাজকীয় নথিপত্রে তার বহু আগে, ষোড়শ শতকের শেষ ভাগেই কুমিল্লা অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্বের দাবি

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে।[৫৫] তবে পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময়ের মধ্যে এ অঞ্চলে কোন মুঘল স্থাপত্য নির্মিত না হওয়া এই ধারণাকে সমর্থন করে না। পার্বত্য ত্রিপুরার মানিক্য রাজারাও ষোড়শ শতকের শেষাংশে এ অঞ্চলে কর্তৃত্বের দাবি করেছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ সময় বৃহত্তর কুমিল্লার অধিকাংশ স্থান ছিল তাদেরও কর্তৃত্বের বাইরে। সমকালীন ইতিহাসের নানা সূত্রের বিশ্লেষণ থেকে অনুমান করা হয় এ সময় কুমিল্লা অঞ্চলের প্রশাসন ছিল ভাটির বারো ভূঁইয়াদের নেতা ঈসা খাঁ ও তার বংশধরদের অধীনে। বর্তমান গবেষণায় খুঁজে পাওয়া সরাইল মসজিদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট এই অনুমানের পক্ষেই সমর্থন যোগায়। শিলালিপি অনুসারে এই মসজিদটি যদিও সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে ১৬৬৩ সালে জনৈক নুর মোহাম্মদের স্ত্রী নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু এর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট দেখে মনে হয় এটি প্রকৃত পক্ষে তার আগেই কোন এক সময়ে নির্মিত হয়েছিল।

পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটিতে বাংলায় প্রচলিত সুলতানি ও মুঘল উভয় যুগেরই স্থাপত্য শৈলির সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়। পিপার ওপর স্থাপিত এবং কলস নকশার শীর্ষচুড়া শোভিত এই মসজিদের কন্দাকৃতির গম্বুজ, গম্বুজের গায়ে ও মসজিদের ভেতরে-বাইরের দেওয়ালে পলেস্তারা অলঙ্করণ, আর পার্শ্ববুরুজগুলোর ছাদ ছাড়িয়ে উঠে যাওয়া মুঘল যুগের স্থাপত্য শৈলির নিদর্শন। আর এর পোড়ামাটির অলঙ্করণ এবং বক্র কর্নিশ মনে করিয়ে দেয় সুলতানি যুগের স্থাপত্য শৈলিকে। সমসাময়িক কালে নির্মিত এবং মাত্র ২৪ কিলোমিটার দূরে বারো ভূঁইয়াদের প্রভাব বলয়ে অবস্থিত অষ্টগ্রামের কুতুবশাহী মসজিদের সঙ্গে এর সাদৃশ্য দেখে একে সুলতানি ও মুঘল স্থাপত্যশৈলির যুগসন্ধিক্ষণে নির্মিত বলেই মনে হয়।

---

৫৫. রাজা তোডরমল্লের রাজস্ব তালিকায় কুমিল্লা অঞ্চলকেও সুবাহ বাংলার অন্তর্ভুক্ত দেখানো হয়েছে, দ্রষ্টব্য Abul Fazl, *Ain-i-Akbari,* (Translated into English by H.S. Jarrett, Corrected and annoted by J.N. Sarkar), Calcutta, 1949, vol. III, pp 59-60

Dhaka University Institutional Repository

এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত মসজিদগুলোর মধ্যে স্থাপত্য শৈলির বিচারে এই মসজিদটিই কেবল ব্যতিক্রমী। অন্য সব কটি মসজিদেই রয়েছে সুবাহদার শায়েস্তা খানের আমলে (১৬৬৩-৭৮, ১৬৭৯-৮৮) বিকশিত মুঘল বাংলার প্রাদেশিক স্থাপত্য রীতির হুবহু প্রতিফলন। মুঘল স্থাপত্যরীতির এ নতুন ধারাটির বিকাশ ঘটেছিল রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে। তবে এর সূচনা মোটেও ঢাকাকেন্দ্রিক নয়। মুঘলদের বাংলা জয়ের আগের দুই শতকে বাংলার যে নিজস্ব ধারার স্থাপত্য রীতি গড়ে উঠেছিল তা থেকে মুঘল রীতিতে উত্তরণের পালাটি শুরু হয়েছিল ষোড়শ শতকের শেষ লগ্নেই। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত ও বগুড়ার শেরপুরে অবস্থিত খেরুয়া মসজিদে প্রথম এই রীতির ছাপ লক্ষ্য করা যায়। এই মসজিদটির নির্মাতা জওহর আলি কাকশালের পুত্র মুরাদ খান অবশ্য মুঘলদের অনুগত রাজপ্রতিনিধি ছিলেন না, ছিলেন বাংলায় মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনাকারী 'কাকশাল'দের প্রতিনিধি। এরা মুঘল সেনাবাহিনীরই সঙ্গে বাংলায় এসেছিলেন উত্তর ভারত থেকে, তবে সম্রাট আকবরের সুবাহদারদের সঙ্গে বিরোধের সূত্র ধরে বিদ্রোহী হয়ে কিছু সময়ের জন্য কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উত্তর পশ্চিম বাংলার বিস্তৃর্ণ এলাকায়। তবে মুঘলদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও রুচিবোধের দিক থেকে তারা রয়ে গেছেন উত্তর ভারতীয়ই। খেরুয়া মসজিদ তার চিহ্ন বহন করছে। এ মসজিদেই প্রথম এক আইল আর তিন বেতে বিভক্ত তিন গম্বুজবিশিষ্ট পরিকল্পনার ব্যবহার হয়েছে, পরবর্তীতে যা বাংলার মুঘল স্থাপত্যের আদর্শে পরিণত হয়েছে। নির্মাণশৈলিতে অবশ্য এখানেও বাংলার সুলতানি আমলের রীতি-কৌশলই ব্যবহৃত হয়েছে, তবে আনুমানিক ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে নতুন রাজধানী রাজমহলে নির্মিত মানসিংহের মসজিদে এক্ষেত্রেও উত্তরণের ছাপ দেখা যায়। পাঁচ বে বিশিষ্ট এ মসজিদের কেন্দ্রীয় বে'কে ঘিরে নির্মিত দুপাশের বে দুটি নির্মিত হয়েছে দ্বিতল বিশিষ্ট পরিকল্পনায়। এছাড়াও এর সম্মুখ ভাগে

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় বে'র প্রবেশপথের মুখে বিশাল উঁচু একটি পিস্তাক ছিল[৫৬], যা ফতেহপুর সিক্রিতে নির্মিত আকবরের স্থাপনাসমূহের কথা মনে করিয়ে দেয়। এ বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্য পরে আর সেভাবে অনুকৃত হয়নি কখনো, তবে এর অভ্যন্তরভাগের দেওয়ালে সংযুক্ত চুন-সুরকির পলেস্তারা আর ছাদের সমান্তরাল কর্নিশ পরবর্তীতে মুঘল বাংলার স্থাপত্যে আদর্শ হয়ে ওঠে। ১৬০৯ সালে ঢাকায় প্রথমবার রাজধানী স্থাপিত হয়, তবে সুবাহদার ইসলাম খানকে এ সময় বারোভূঁইয়াদের বিদ্রোহ দমনে এতটাই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে তিনি স্থাপত্য নির্মাণে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পাননি। তবে ১৬৩৯ সালে সুবাহদার শাহ সুজার কর্তৃত্ব গ্রহণের পর থেকে এ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ফিরতে শুরু করলে শুরু হয় বাংলা স্থাপত্যের এক নতুন যুগ। শাহ সুজা ঢাকা থেকে রাজধানী আবার রাজমহলে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আগ্রা দুর্গে তার পিতা শাহজাহানের প্রাসাদের অনুকরণে সেখানে তিনি একটি প্রাসাদ গড়ে তোলেন। এ প্রাসাদের কোন চিহ্ন এখন অবশ্য নেই, কেবল টিকে আছে সাঙ্গি দালান নামে পরিচিত একটি ছোট ইমারত, পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলিতে যা আগ্রার খাস মহলের অনুরূপ। বাংলার মুঘল স্থাপত্যে এধরণের আবাসিক ইমারত অবশ্য নির্মিত হয়েছে খুব কমই। ঢাকার লালবাগ কমপ্লেক্স (নির্মাণকাল আনুমানিক ১৬৬৩-৮৮) এর একটি উদাহরণ। বাগানশোভিত পরিবেশে একটি মসজিদ, একটি সমাধি এবং বিশেষ করে ঝরোকাসদৃশ একটি দরবার কক্ষ ও হাম্মাম নিয়ে গঠিত লালবাগ দিল্লী-আগ্রা-ফতেহপুর সিক্রির মুঘল রাজকীয় স্থাপত্যের চাহারবাগ রীতির বাগান কমপ্লেক্সগুলোর কথাই মনে করিয়ে দেয়। সুবাহদার শাহ সুজার সময়েই ঢাকায় নির্মিত বড় কাটরা (১৬৪৪) বাংলার রাজকীয় মুঘল স্থাপত্যের আরেকটি নিদর্শন। অনেকগুলো দোকান, আবাসিক কক্ষ এবং একটি বিশাল প্রবেশ তোরণবিশিষ্ট এই বড়কাটরা অবশ্য এখন প্রায়

---

৫৬. Martin, M. *History, Antiquities, Topography and Stitistics of Eastern India,* vol. II, London, 1838, p. 70

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে, তবে নিকটবর্তী এলাকার অনেকগুলো মসজিদ ও সমাধি এখনো টিকে আছে মুঘল যুগের স্মারক হয়ে। সাতগম্বুজ মসজিদ (১৬৬৪-৭৬), হাজি খাজা শাহবাজের মসজিদ ও সমাধি (১৬৭৯), খান মুহম্মদ মৃধার মসজিদ (১৭০৪) প্রভৃতি এর উদাহরণ। পূর্ববর্তী তিন শতাব্দী ধরে বাংলায় প্রচলিত পলেস্তারাবিহিন ভারি ইটের দেওয়াল, বক্র কর্নিশ, ছাদ পর্যন্ত প্রলম্বিত পার্শ্ববুরুজ, দ্বিকেন্দ্রিক খিলানবিশিষ্ট নিচু প্রবেশপথ, পিপাবিহিন অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ আর টেরাকোটা অলঙ্করণের পরিবর্তে এসব স্থাপত্যে ব্যবহৃত হয়েছে পলেস্তারা ঢাকা দেওয়াল, সমতল ছাদ, বঙ্ক পদ্মপাঁপড়ির নকশাশোভিত প্যারাপেট, ছাদ ছাড়িয়ে ওপরে উঠে যাওয়া অপেক্ষাকৃত সরু পার্শ্ববুরুজ, অর্ধগম্বুজ আকৃতির ভল্টে আচ্ছাদিত ইওয়ানসদৃশ প্রবেশদ্বার, কন্দাকৃতির গম্বুজ এবং দেওয়ালের গায়ে পলেস্তারা দিয়ে তৈরি খোপ নকশার অলঙ্করণ। এ সব স্থাপত্যে যে নতুন নির্মাণরীতি ব্যবহৃত হয়েছে, তাই এরপর বাংলায় মুঘল স্থাপত্যের আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

আমাদের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আটটি মসজিদের সাতটিতেই হুবহু এই রীতিই অনুসৃত হয়েছে। ব্যতিক্রম কেবল পূর্বোক্ত সরাইল মসজিদ। মসজিদগুলোর মধ্যে পাঁচটির পরিকল্পনা পুর্বোক্ত হাজি খাজা শাহবাজের মসজিদ কিংবা সাতগম্বুজ মসজিদের অনুরূপ, এগুলোও একটি বাধানো চত্বরের পশ্চিম অর্ধাংশ জুড়ে নির্মিত এবং তিনটি বেতে বিভক্ত ও তিনটি গম্বুজে আচ্ছাদিত। অন্য তিনটির মধ্যে সরাইল মসজিদসহ দুটির পরিকল্পনা আয়তাকার ও পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট এবং অবশিষ্টটির বর্গাকার ও এক গম্বুজবিশিষ্ট - তবে এই ভূমি পরিকল্পনা ছাড়া এগুলোর মধ্যে পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই মসজিদগুলোর মধ্যে চারটিতে মূল মসজিদের সামনের উন্মুক্ত চত্বরকে (বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য এগুলো এখন আচ্ছাদিত

Dhaka University Institutional Repository

বারান্দার রূপ নিয়েছে) ঘিরে নির্মিত হয়েছে একটি অনুচ্চ প্রাচীর এবং এ প্রাচীরের পূর্বাংশের মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে একটি আনুষ্ঠানিক প্রবেশ তোরণ। কুমিল্লা শহরের শাহ সুজা মসজিদে এর সবচেয়ে পরিশীলিত রূপটি দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতল বিশিষ্ট এ তোরণটির দ্বিতীয় তলে ওঠার ব্যবস্থা দেখে বোঝা যায় এটি এক সময় আজান দেওয়ার কাজেও ব্যবহৃত হতো। উলচাপাড়া, আরিফাইল ও বড় শরীফপুরের মসজিদের তোরণগুলো এত সুবিন্যস্ত নয়, তবে এগুলোরও শীর্ষে ওঠার ব্যবস্থা ছিল।

কুমিল্লা অঞ্চলে মুঘল যুগের নিদর্শনবাহী একমাত্র সমাধিটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। হুমায়ুনের সমাধি, তাজমহল প্রভৃতি রাজকীয় মুঘল সমাধি কিংবা তার অনুকরণে বাংলায় নির্মিত পূর্বোক্ত লালবাগ কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে অবস্থিত পরিবিবির সমাধি বা নারায়ণগঞ্জের বিবি মরিয়মের সমাধির মতো চাহারবাগ পরিকল্পনার বিশাল কোন কমপ্লেক্সের অংশ নয় এটি। তবে একবারে বিচ্ছিন্ন কোন ইমারতও নয়। এর ঠিক পাশেই অবস্থিত বর্তমান গবেষণায় খুঁজে পাওয়া সর্ববৃহৎ মসজিদটি। বাংলার মুঘল সমাধি স্থাপত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সমাধি ও মসজিদের এ ধরনের সহাবস্থানকেও অভিনব মনে হবে না। গৌড়ের শাহ নিয়ামতউল্লাহ ওয়ালির সমাধি (সপ্তদশ শতক), ঢাকার হাজি খাজা শাহবাজের সমাধি (১৬৭৯), খাজা আনোয়ারের সমাধি (সপ্তদশ শতকের শেষভাগ) এবং আরো পরে নির্মিত মুর্শিদাবাদের আজিমুন্নিসা বেগমের সমাধি (১৭৩৪), নবাব সুজাউদ্দিনের সমাধি (১৭৩৮-৩৯) ও বদর নিসা বেগমের সমাধি (১৮৪০) প্রভৃতিও নির্মিত হয়েছে সংলগ্ন মসজিদসহ। এর মধ্যে হাজি খাজা শাহবাজের সমাধির সঙ্গেই আলোচ্য আরিফাইলের সমাধির মিল সবচেয়ে বেশি। ঢাকার সমাধিটিতেও এক সময় গ্রাম বাংলার কুঁড়েঘরের অনুরূপ দো-চালা ভল্টে আচ্ছাদিত সংলগ্ন একটি

Dhaka University Institutional Repository

বারান্দা ছিল, বর্তমানে যার চিহ্ন আর দেখা যায় না।[৫৭] এ রকম দোচালার ব্যবহার আরো দেখা যায় খাজা আনোয়ারের সমাধিতেও, তবে সেখানে শুধু একদিকে নয়, মূল সমাধির উভয় দিকেই দুটি দোচালা আচ্ছাদিত সংলগ্ন কক্ষ রয়েছে। এ সমাধিটির আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ বৈশিষ্ট এটি বাংলাদেশের একমাত্র দ্বিতল সমাধি, যেখানে নিচের প্ল্যাটফর্মের ওপরে দ্বিতীয় তলে দুটি কৃত্রিম সমাধিপ্রস্তর নির্মিত হয়েছে। মুঘল সমাধি স্থাপত্যে অবশ্য এটি মোটেই নতুন কিছু নয়। হুমায়ুনের সমাধি কিংবা তাজমহলের মতো বিখ্যাত সমাধিগুলোতেও মুঘলরা এমন দ্বিতল বিশিষ্ট পরিকল্পনা ব্যবহার করেছে। এ সব বৈশিষ্টের তুলনা থেকে শিলালিপিবিহিন আলোচ্য আরিফাইল সমাধির নির্মাণকাল সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। এ সমাধি সম্পর্কে নিকটবর্তী অঞ্চলে নানা রকম জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। সেগুলো এ রকম :

ক. এটি শাহ আরিফ নামে জনৈক সুফি সাধক ও তার পত্নীর সমাধি [৫৮]

খ. এটি সরাইলের জমিদার দেওয়ান নুর আলী (মতান্তরে নুর মোহাম্মদ) ও তার পত্নীর সমাধি [৫৯]

গ. এটি মুঘল সেনাপতি সৈয়দ হাফিজ মোহাম্মদ খান ও আহমদ খানের সমাধি।[৬০] প্রথমোক্ত ব্যক্তি মুঘল সুবাহদার শাহবাজ খানের (১৫৮৩-৮৬) সঙ্গে বাংলায় এসেছিলেন বলে জানা যায়[৬১] যদিও আকবরনামার বর্ণনায় তার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

---

৫৭. Asher, C. B., 'Inventory to the key monuments', in *Islamic Heritage of Bengal,* edited by G. Michell, Paris, 1984, p. 80

৫৮. আ. কা. মো. যাকারিয়ার মতে শাহ আরিফের পত্নীর নাম আরফান্নেসা, দ্রষ্টব্য, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ,* ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৫৫৩; কিন্তু অন্য একটি সূত্রে শাহ আরিফের স্ত্রীর নাম সাগর বিবি বলে জানা যায়, দ্রষ্টব্য আফজালুর রহমান,'সাগর-দীঘির জোড় কবর', *দৈনিক ইত্তেফাক,* ১৯ নভেম্বর, ১৯৮৭

৫৯. বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর বিভাগের ২০ আগস্ট, ১৯৮৫ তারিখের প্রতিবেদন

৬০. Khatun, Habiba, 'The tomb at Arifail in Comilla District', in *Journal of the Varendra Research Museum,* vol. 7, Rajshahi,1985, pp. 185-86

৬১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস,* ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯২৪, পৃ. ২৯৩

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত তিনটি মতের মধ্যে প্রথম দুটিতে কোন নির্দিষ্ট সময়কালের উল্লেখ নেই, তবে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধে হাবিবা খাতুন প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এ সমাধির নির্মাণকাল ১৬২০-৩০ সালের মধ্যে।[৬২] তার যুক্তি - সুবাহদার ইসলাম খান মাশহাদি (১৬১০-২৭) কিংবা আরো সম্ভাব্য তার উত্তরাধিকারী ফিদাই খানের সময়ে (১৬২৭) মুঘলদের হয়ে যুদ্ধের পুরস্কার হিসেবে সৈয়দ মোহাম্মদ খান সরাইলের 'নওয়ারা' জমিদারি লাভ করেন এবং তিনিই এই সমাধি ও মসজিদ নির্মাণ করেন। আরিফাইল গ্রামটি যে মৌজায় অবস্থিত সেটির নাম নওয়া হাবিবি, যা এ নওয়ারা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এমনকি আরিফাইল নামটির পিছনেও তিনি এ ঘটনার সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। সম্রাট শাহজাহানের সময়ে বিশেষ করে মগদের বিরুদ্ধে মুঘলদের বিজয় অভিযানে নৌকা অথবা সৈন্য প্রেরণের মাধ্যমে সাহায্য করা কিংবা সরাসরি অংশ গ্রহণের পুরস্কার হিসেবে সম্রাট সংশ্লিষ্টদের যথাক্রমে নওয়ারা ও হিসাজাত নামে দু ধরনের নিস্কর জমিদারি প্রদান করতেন।[৬৩]এ সব জমিদারির মালিকদের বলা হতো আলিফাদার বা আলিফাপারতাস। এখান থেকেই আরিফাইল নামটি এসেছে বলে হাবিবা খাতুন মনে করেন।[৬৪] তার আরেকটি যুক্তি, মাত্র অর্ধ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সরাইল মসজিদের সঙ্গে স্থাপত্যিক বৈশিষ্টের মিল দেখে দুটি ইমারতকে সমসাময়িক মনে হয়। কিন্তু তিনি ভুলক্রমে সরাইল মসজিদের নির্মাণকাল ১০২৫ হিজরি (১৬১৫ খ্রিস্টাব্দ) বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৫] প্রকৃতপক্ষে তা হবে ১০৭৪ হিজরি (১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ)। এছাড়া যদি সত্যিই সৈয়দ মুহম্মদ খান সুবাহদার শাহবাজ খানের সঙ্গে বাংলায় এসে থাকেন, তাহলে তার ৪৪ বছর পর ১৬২৭ সালে তার

---

৬২. Khatun, Habiba, *Op. Cit.*, p 186
৬৩. Ray Chowdhury, T.K., *Bengal under Akbar and Jahangir,* Delhi, 1969, p. 78
৬৪. Khatun, Habiba, *Op. Cit.*, p 186
৬৫. Khatun, Habiba, *Op. Cit.*, p 184, foot-note 3

Dhaka University Institutional Repository

নওয়ারা জমিদারি লাভের ব্যাপারটিও অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। আলোচ্য ইমারতটির স্থাপত্যিক বৈশিষ্টও যে সতের শতকের প্রথম ভাগের নয়, বরং দ্বিতীয় ভাগের নির্মাণশৈলির চিহ্ন বহন করছে তা আমরা উপরের আলোচনাতেই প্রমাণ করেছি। সুতরাং এটি সৈয়দ মুহম্মদ খানের সমাধি হতে পারে না।

এ সমাধি সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় মতটি বরং অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এ ধারণার উৎস মূলত পূর্বোক্ত সরাইল মসজিদের শিলালিপি, যেখানে নির্মাতার নাম 'মজলিশ শাহবাজের পুত্র নুর মোহাম্মদের স্ত্রী' বলে উল্লেখ রয়েছে।[৬৬] এ নুর মোহাম্মদের পূর্বোক্ত নওয়ারা জমিদারের কোন উত্তরাধিকারি হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

তবে আমাদের বিবেচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আলোচ্য ইমারতগুলোর অবস্থান। কুমিল্লা শহরে অবস্থিত শাহ সুজা মসজিদ এবং সরাইল বাজারের মধ্যে অবস্থিত সরাইল মসজিদ ছাড়া বাকি সবকটি মসজিদ ও সমাধি নির্মিত হয়েছে একেবারে গ্রামাঞ্চলে, যেখানে মুঘল যুগে তো নয়ই, অদ্যাবধি কখনো নাগরিক পরিবেশ গড়েই ওঠে নি সে অর্থে। মধ্যযুগের ইতিহাসের নিরীখে ব্যাপারটি অস্বাভাবিক। সাধারণত এ ধরনের ইমারত নির্মিত হতো নাগরিক পরিবেশেরই অংশ হিসেবে। গ্রামের সাধারণ মানুষের পক্ষে এ রকম ইমারত নির্মাণ মোটেও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। প্রশাসনের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে যুক্ত গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তিদের পক্ষেই কেবল মানানসই ছিল এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া। শাহ সুজা মসজিদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি সত্যি। শিলালিপি না থাকলেও স্থাপত্যিক বৈশিষ্টের বিচারে এটিকে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ের ইমারত হিসেবে চিহ্নিত করা যায় অনায়াসে। ঠিক এ রকম সময়েই মুঘলদের নতুন একটি 'থানা' হিসেবে গড়ে উঠছিল কুমিল্লা

---

৬৬. দ্রষ্টব্য , *পরিশিষ্ট ১, পৃ ৮৪*

Dhaka University Institutional Repository

শহরটি। মসজিদটি শহরের যে এলাকায় অবস্থিত সেটি এখনো পরিচিত 'মোঘলটুলি' নামে, যদিও মুঘলদের আর কোন চিহ্ন এখন সেখানে নেই।

সরাইলও অনেক আগে থেকেই একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র পরগণা হিসেবে পরিচিত। নিকটবর্তী আরিফাইলের মসজিদ ও সমাধির সঙ্গেও যে সরাইলের জমিদারদের সংশ্লিষ্টতা ছিল, উপরের আলোচনায় তা প্রমাণিত হয়েছে। ওয়ালিপুরের আলমগীরি মসজিদ ও বড় শরীফপুরের 'বাদশাহী' মসজিদ তো তাদের নামের মধ্যেই বহন করছে মুঘল প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার চিহ্ন। ওয়ালিপুরে খুব কাছাকাছি অবস্থানে অনুরূপ আরেকটি মসজিদের অবস্থানও ইঙ্গিত দেয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ কোন মুঘল প্রশাসকের উপস্থিতির।

সুতরাং এ মসজিদগুলোর সঙ্গে মুঘল প্রশাসনের যোগসূত্র যে ছিল তা নিয়ে আর সংশয়ের অপেক্ষা থাকে না। প্রশ্ন হচ্ছে, মুঘল প্রশাসকরা মসজিদ নির্মাণের জন্য এমন নিভৃত পল্লীকে বেছে নিলেন কেন। আর নিলেনই যদি তবে সেই পল্লীকে ঘিরে পরবর্তীতে নগরায়ণ গড়ে উঠলো না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এ অঞ্চলের মুঘল প্রশাসনের চরিত্রের মধ্যেই। সুবাহদার ইব্রাহিম খান ফতেহ জংয়ের শাসনকালে মুঘলরা এ অঞ্চল জয় করে, তবে এখানে প্রত্যক্ষ মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়নি কখনো। মুঘলরা বরং করদ মিত্র ত্রিপুরার রাজা কিংবা স্থানীয় জমিদারদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন এ অঞ্চলের প্রশাসন। তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য কেবল মেহেরকুলে (বর্তমান কুমিল্লা শহর) রাখা হয়েছে একটি মুঘল থানা। এই থানাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে পরবর্তীকালের কুমিল্লা শহর। তবে এই থানার কর্তৃত্বে যে সব মুঘল কর্মকর্তা দায়িত্ব পেতেন, বাংলায় আগত অন্যান্য মুঘল কর্মকর্তাদের মতোই তারাও কখনোই এ অঞ্চলে স্থায়ি নিবাস গড়ার কথা ভাবেন নি। তাই কুমিল্লার মোঘলটুলিতেও একটি মসজিদ ছাড়া মুঘল কর্মকর্তাদের কোন রকম আবাসিক স্থাপত্যের চিহ্ন নেই।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত মুঘল সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীয় প্রশাসনেরই প্রতিচ্ছবি। সুবাহদার ইসলাম খানের সময় থেকে বাংলার প্রাদেশিক প্রশাসনেও তার অনুকরণের প্রচেষ্টা চলেছে। রাজধানীতে রাজকীয় আড়ম্বরের সব আয়োজন, এমনকি ঝরোকা দর্শনেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। কিন্তু মুঘল বাংলার তৃণমূল পর্যায়ের প্রশাসনে এই ধারা বজায় থাকে নি। এর একটি কারণ বাংলা অভিযানের শুরুতেই মুনিম খানের বিপর্যয়ের পর মুঘলরা বাংলাকে বিদেশ-বিভূঁই বলেই জেনেছে, তাই এখানে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেনি কখনো। শুধু তাই নয়, বাংলার স্থানীয় জনগণের সঙ্গেও তারা সুস্পষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতো। পর্তুগিজ লেখক সেবাস্টিয়ান ম্যানরিকের ১৬২৯ সালের বর্ণনায় বাংলায় 'পর্তুগিজ, মুর ও নেটিভ' এই তিনটি সামাজিক শ্রেণীর উল্লেখ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬৭] ম্যানরিকের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, সে সময় নেটিভ, অর্থাৎ স্থানীয়দের পক্ষে কোনভাবেই মুর, অর্থাৎ 'আশরাফ' শ্রেণীভুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না।[৬৮]

সরকার, পরগণা বা চাকলার মতো প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলোর প্রশাসনের দায়িত্ব পাওয়া বহিরাগত মুঘল সেনাপতিদের এই ধরনের মানসিকতা যেমন ছিল, তেমন পাশাপাশি মুঘলরা রাজস্ব আদায়ের কাজে বাংলার স্থানীয় জমিদার শ্রেণীকেও কাজে লাগাতো। বিশেষ করে কুমিল্লার মতো সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এই স্থানীয় জমিদাররাই ছিলেন প্রশাসনের প্রতিনিধি। রাষ্ট্রের আয়ের উৎস বাড়ানোর উদ্দেশে এ সব এলাকায় জঙ্গল সাফ করে নতুন নতুন বসতি ও কর্ষণযোগ্য ভূমি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হতো। এ নতুন কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতেই নওয়ারা ও হিসাজাতের মতো নিষ্কর জমিদারি প্রথা চালু করা হয়েছিল। এ ধরনের জমিদারির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে স্বাভাবিক কারণেই

---

৬৭. Manrique, F.S., *Travels of Fray Sebastien Manrique 1629-1643*, Translated by E. Luard and H. Hosten, Oxford, 1927, vol. I, p. 40.

৬৮. Eaton, R.M., *The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1760*, p.171

Dhaka University Institutional Repository

খোঁজা হতো এমন লোকদের, সমাজে যাদের প্রভাব আছে। বিশেষ করে ধর্মীয় প্রভাব, কারণ সেটাই ছিল সবচেয়ে কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ি। মসজিদ ও সমাধির মতো প্রতিষ্ঠানগুলোই তাই হয়ে উঠেছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুঘল প্রশাসনের কেন্দ্র। আর সে কারণেই মুঘল সরকারের পক্ষ থেকেও এ ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাকে উৎসাহিত করা হতো। কাগজে-কলমে পরগণা ও মৌজার মতো প্রশাসনিক ইউনিটের অস্তিত্ব থাকলেও কার্যত বিশেষ করে মৌজার কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না। এ ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঘিরেই গড়ে উঠতো সমাজ[৬৯] আর সুসংগঠিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ছিল না বলে এই প্রশাসনিক, ধর্মীয় কেন্দ্রগুলোও গড়ে উঠতো অনেক দূরে দূরে। উলচাপাড়া, বড় শরীফপুর, ওয়ালিপুর, আশরাফপুর আর আরিফাইলের মতো স্থানের মসজিদগুলো ছিল এরকমই যুগপৎ ধর্মীয় ও প্রশাসনিক কেন্দ্র।

৬৯. Eaton, R.M., *Op. Cit.* p.232

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১

Dhaka University Institutional Repository

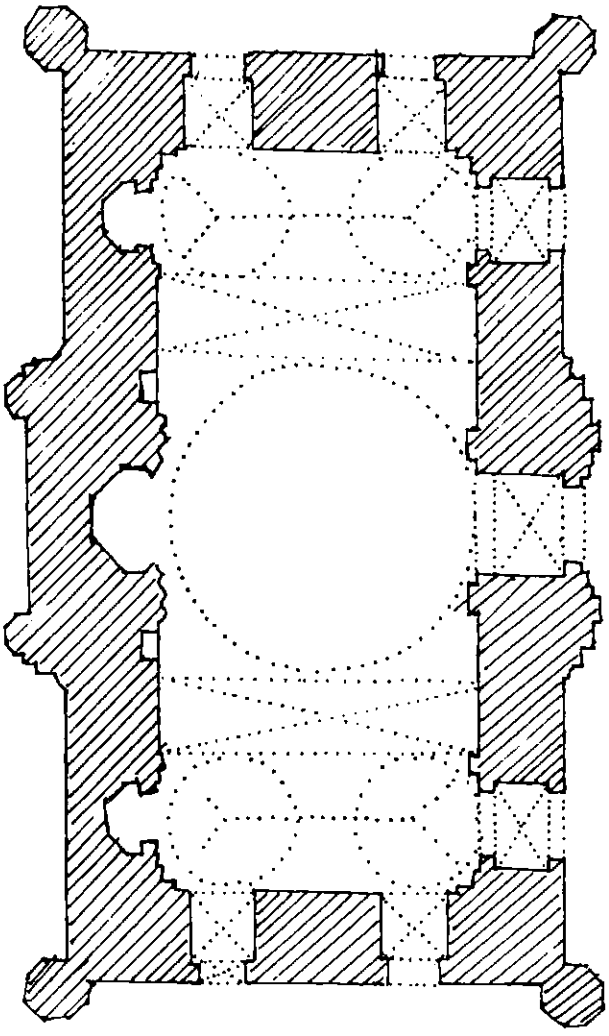

ভূমি পরিকল্পনা-১ : সরাইল মসজিদ

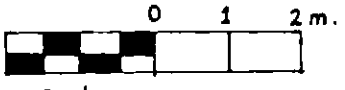

Dhaka University Institutional Repository

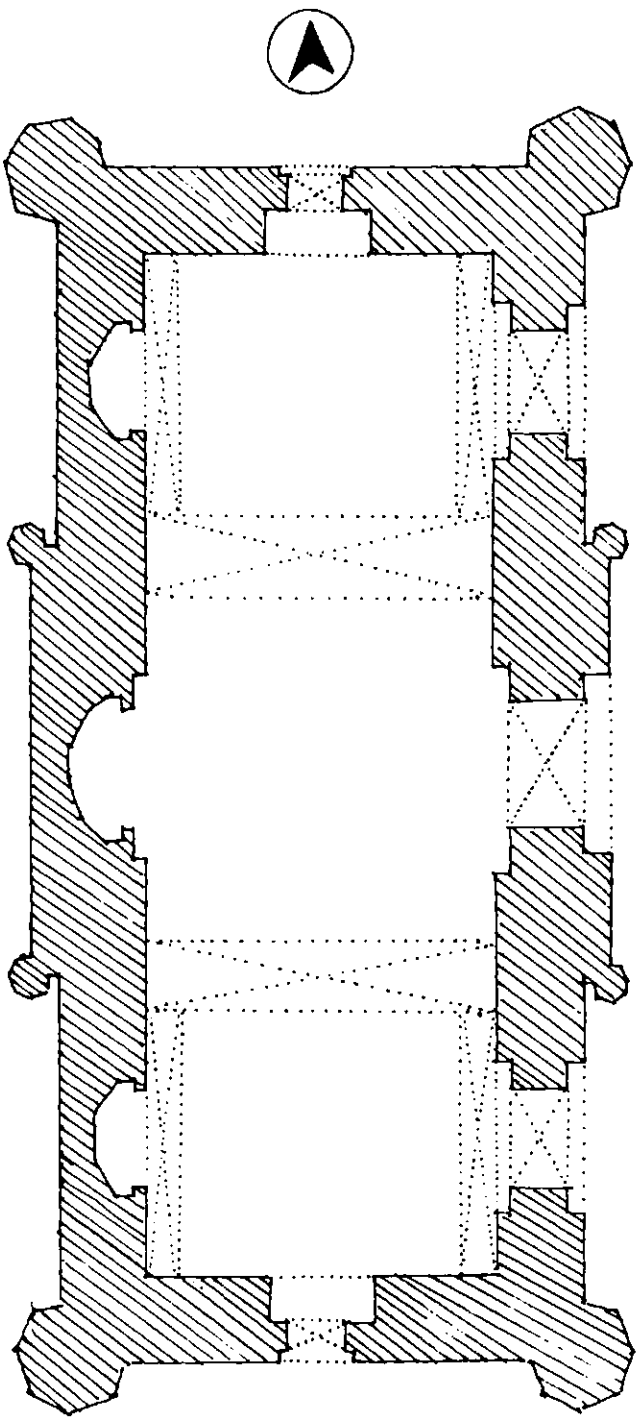

ভূমি পরিকল্পনা - ২ : শাহ সুজা মসজিদ

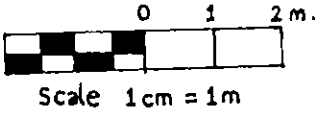

Dhaka University Institutional Repository

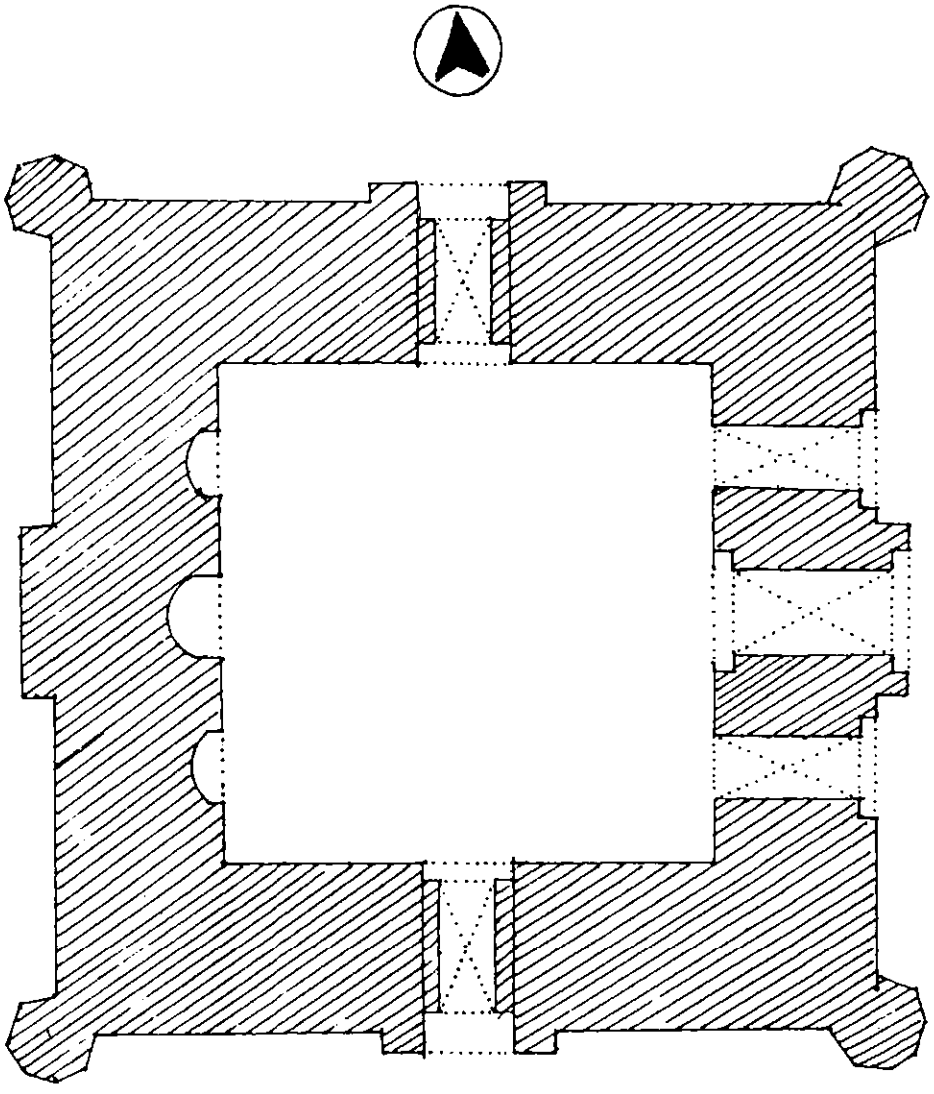

ভূমি পরিকল্পনা-৩ : জাদুঘর মসজিদ

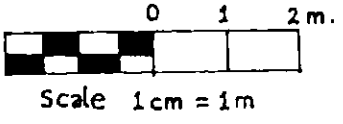

Dhaka University Institutional Repository

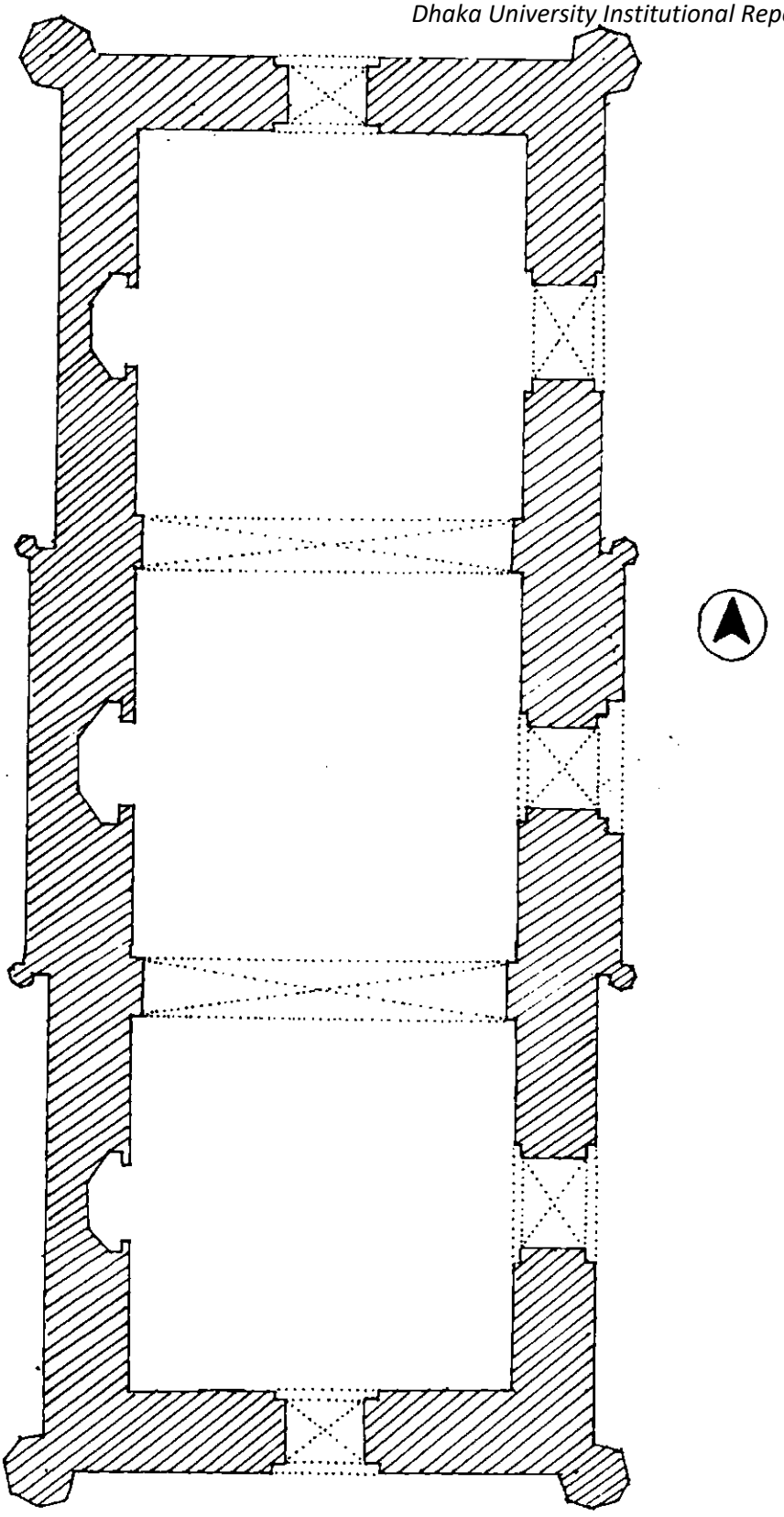

ভূমি পরিকল্পনা - ৪ : আরিফাইল মসজিদ

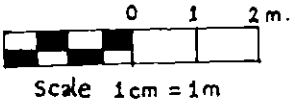

Dhaka University Institutional Repository

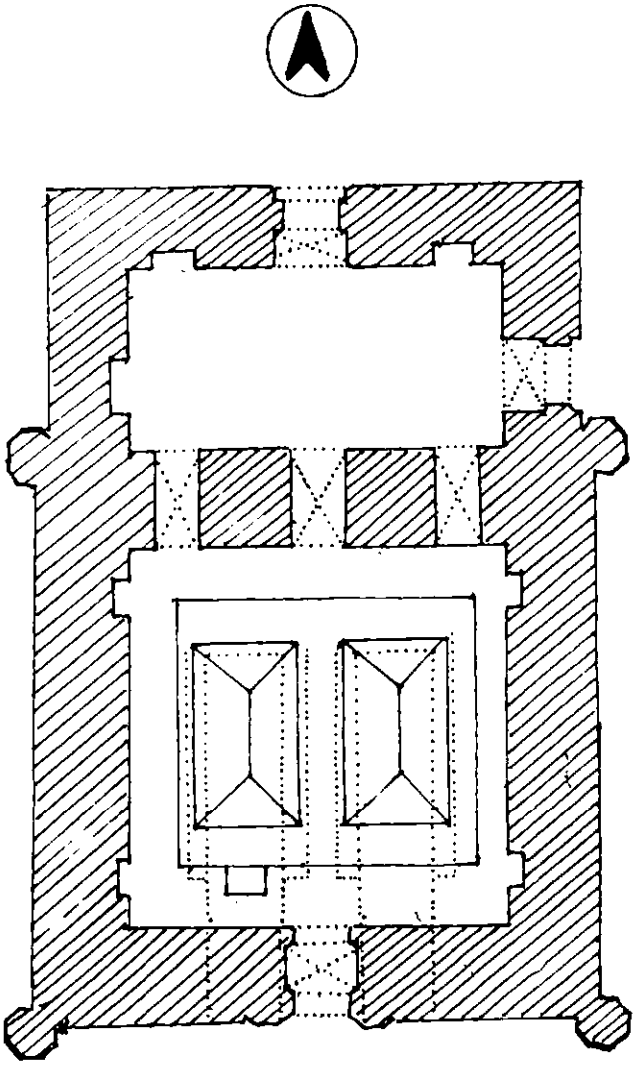

ভূমি পরিকল্পনা -৫ : আরিফাইলের সমাধি

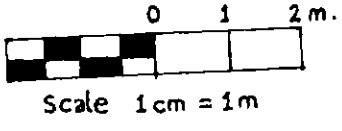

Dhaka University Institutional Repository

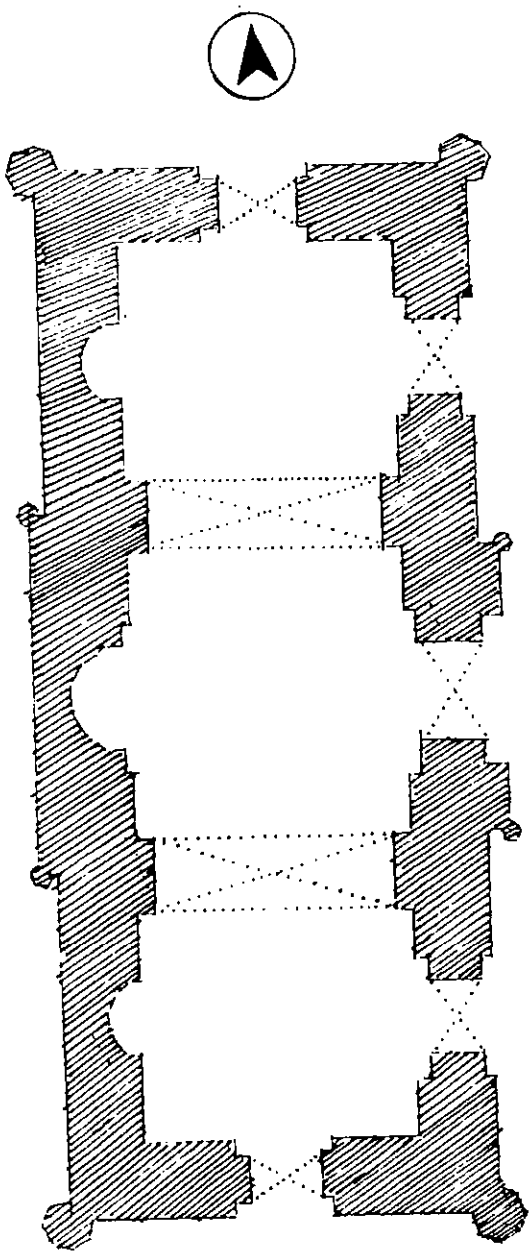

ভূমি পরিকল্পনা-৬ : বড় শরীফপুর মসজিদ

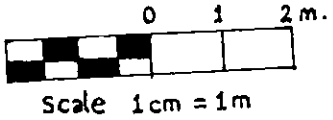

Dhaka University Institutional Repository

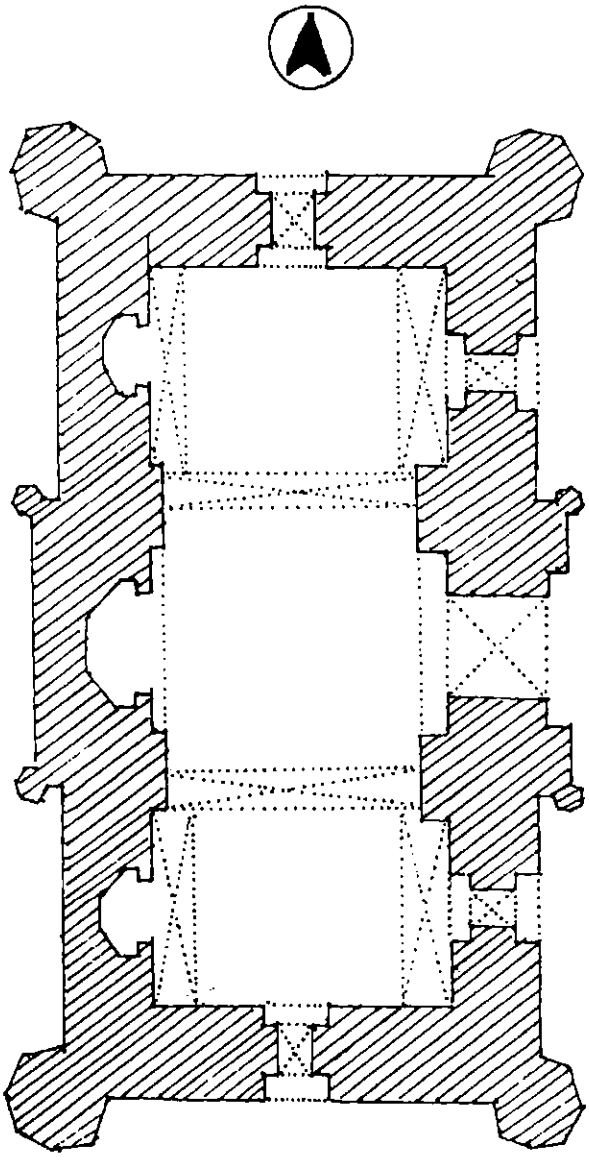

ভূমি পরিকল্পনা - ৭ : উলচাপাড়া মসজিদ

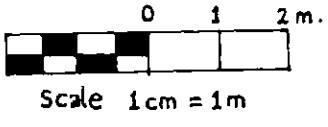

Dhaka University Institutional Repository

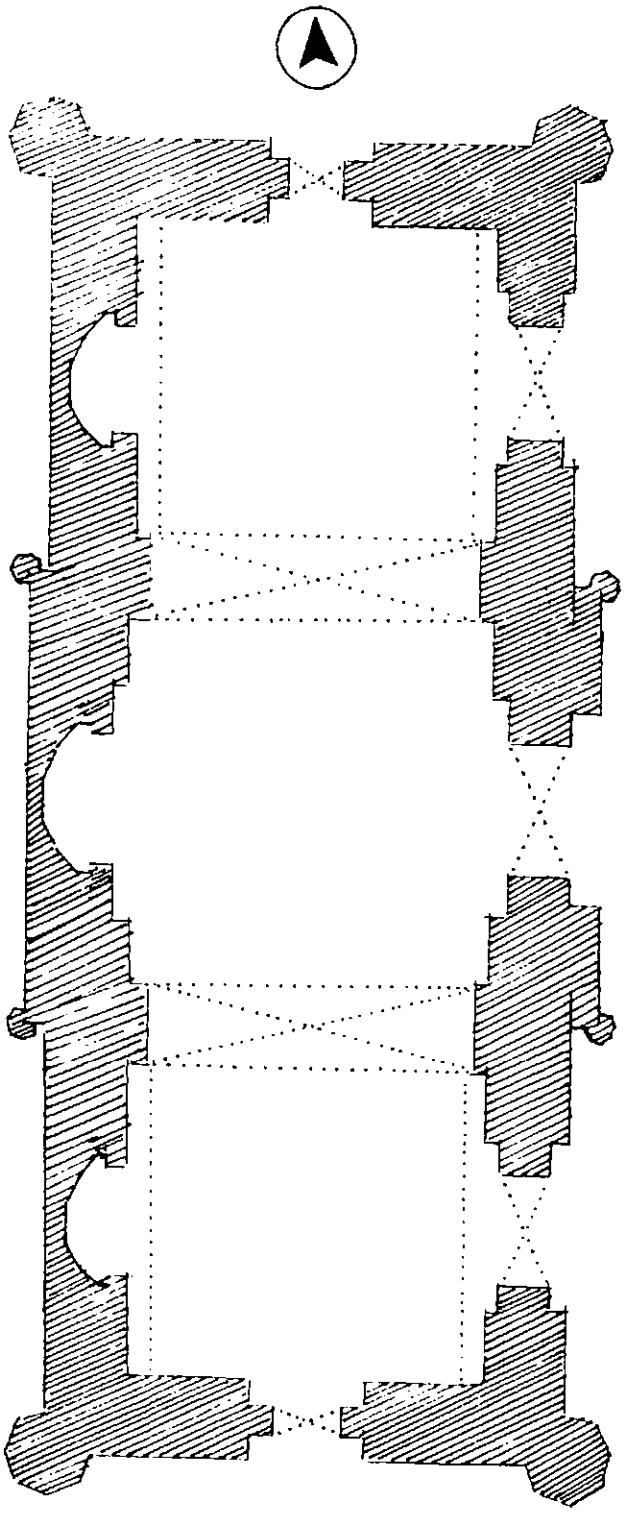

ভূমি পরিকল্পনা - ৮ : আমারাফপুর সদরগাজী মসজিদ

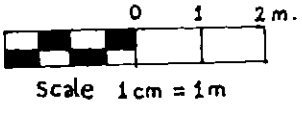

Dhaka University Institutional Repository

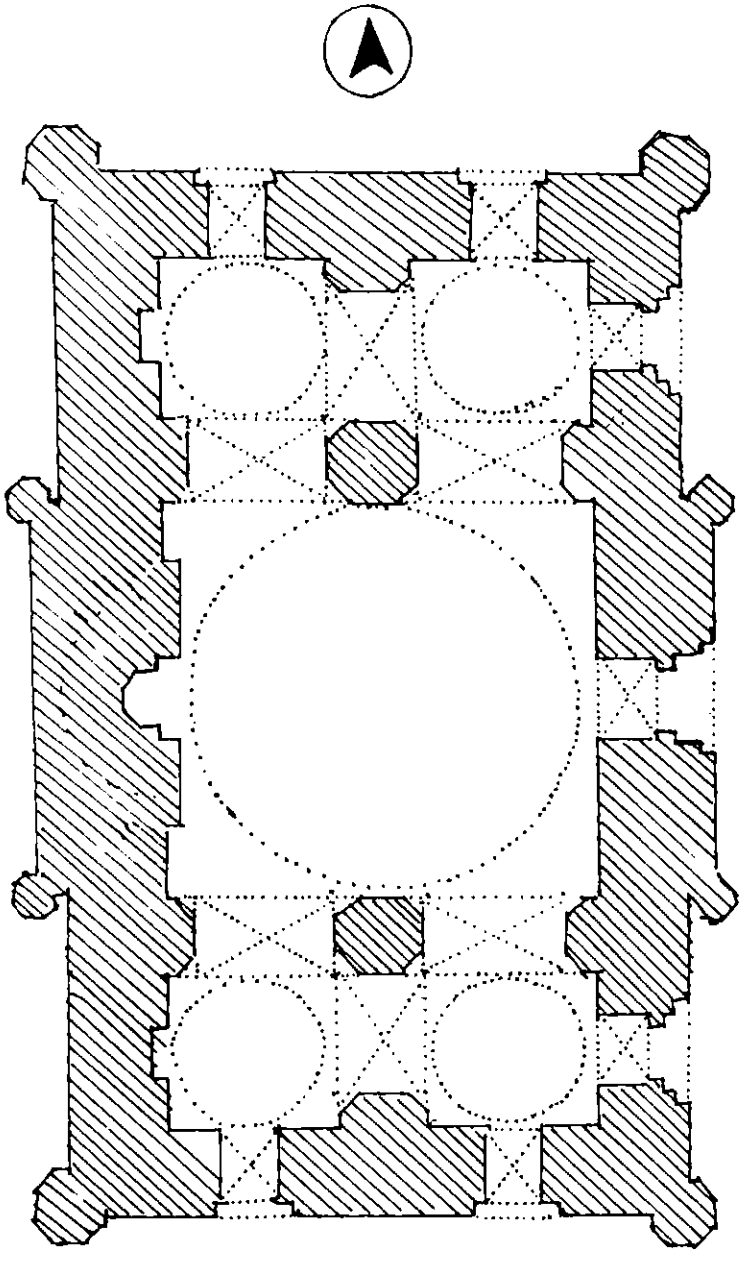

ভূমি পরিকল্পনা - ৯ : ওয়ালিপুর আলমগীরী মসজিদ

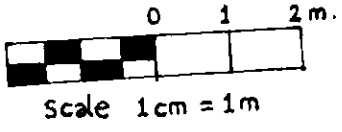

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ২

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ১ : সরাইল মসজিদ, সম্মুখ দৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ২ : সরাইল মসজিদ, পার্শ্বরুজ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ৩ : সরাইল মসজিদ, বক্র কর্নিশসহ পিছনের দৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ৪ : সরাইল মসজিদ, অভ্যন্তরের আড়-খিলান (Transverse Arch)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ৫ : সরাইল মসজিদ, চৌচালা ভল্ট

Dhaka University Institutional Repository

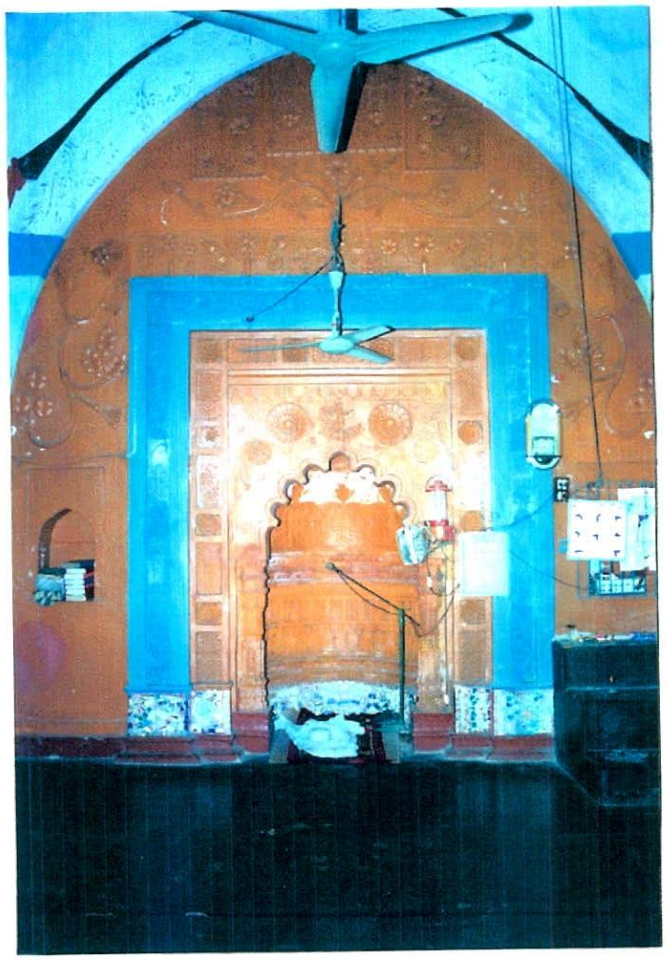

চিত্র - ৬ : সরাইল মসজিদ, কেন্দ্রীয় মিহরাবের অলঙ্করণ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ৭ : শাহ সুজা মসজিদ, সম্মুখ দৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ৮ : শাহ সুজা মসজিদ, প্রবেশপথের তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

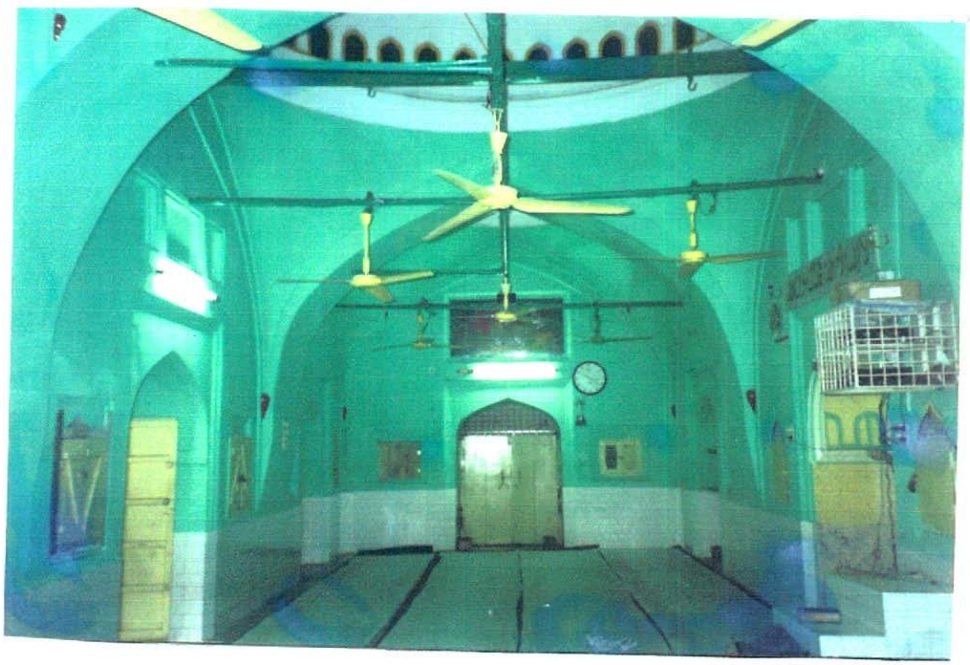

চিত্র - ৯ : শাহ সুজা মসজিদ, অভ্যন্তরের দৃশ্য – আড় খিলান

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ১০ : ভাদুঘর মসজিদ, বর্তমান রূপ

Dhaka University Institutional Repository

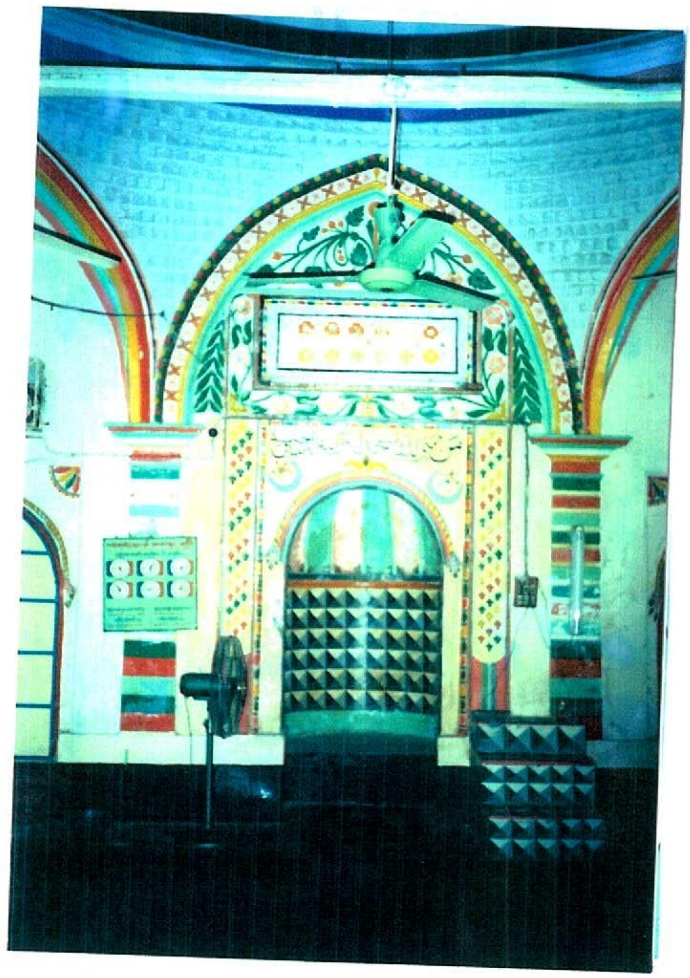

চিত্র - ১১ : ভাদুঘর মসজিদ, বাংলা পান্দানতিফ ও মিহরাবের অলঙ্করণ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ১২ : আরিফাইল মসজিদ, সম্মুখ দৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

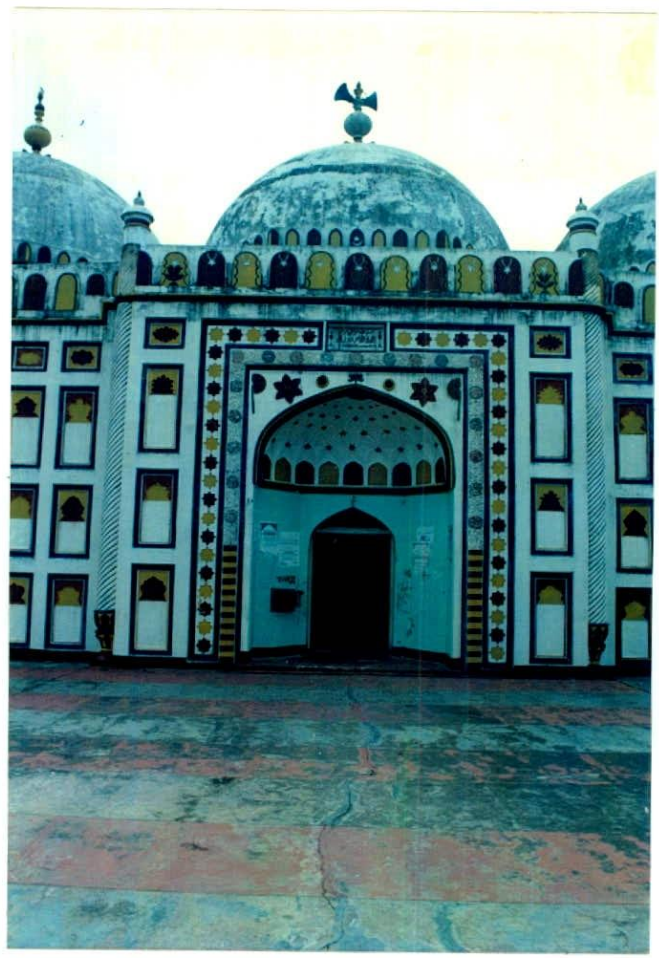

চিত্র - ১৩ : আরিফাইল মসজিদ, কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের অর্ধগম্বুজ

Dhaka University Institutional Repository

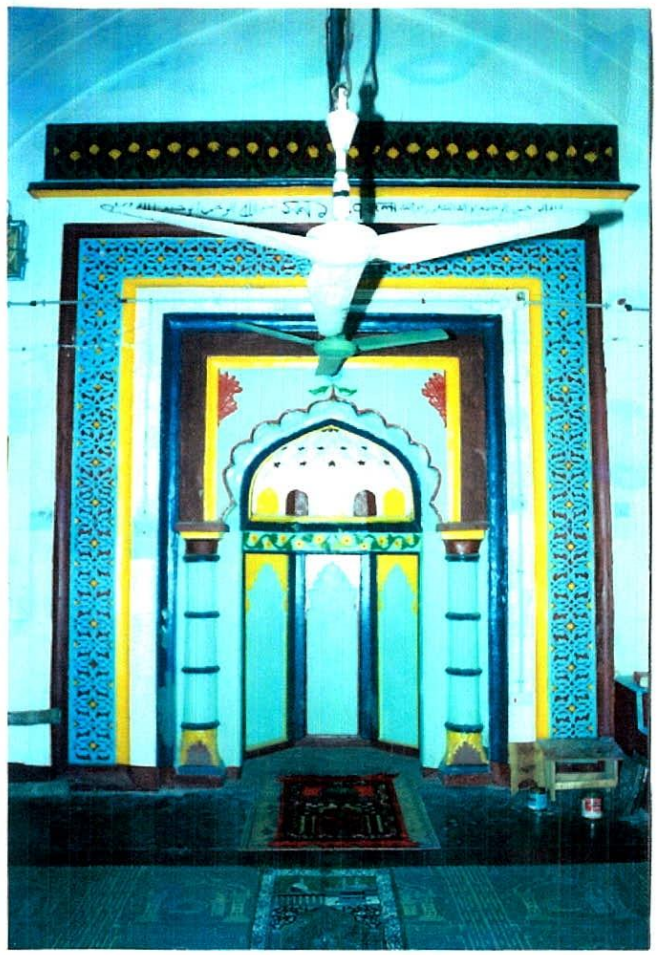

চিত্র - ১৪ : আরিফাইল মসজিদ, অর্ধ-অষ্টকোন কেন্দ্রীয় মিহরাব

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ১৫ : আরিফাইলের সমাধি, দ্বিতল অবয়ব

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ১৬ : আরিফাইলের সমাধি, দোচালাসহ সম্মুখ দৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ১৭ : আরিফাইলের সমাধি, ডিম্বাকৃতির ও সমান্তরাল শবাধার

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ১৮ : আরিফাইলের সমাধি, দোচালাসহ বাতিদান

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ১৯ : বড় শরীফপুর মসজিদ, সম্মুখ দৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ২০ : বড় শরীফপুর মসজিদ, পিছনের দৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ২১ : উলচাপাড়া মসজিদ, বর্তমান সম্মুখ দৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ২২ : উলচাপাড়া মসজিদ, প্রবেশ তোরণ

Dhaka University Institutional Repository

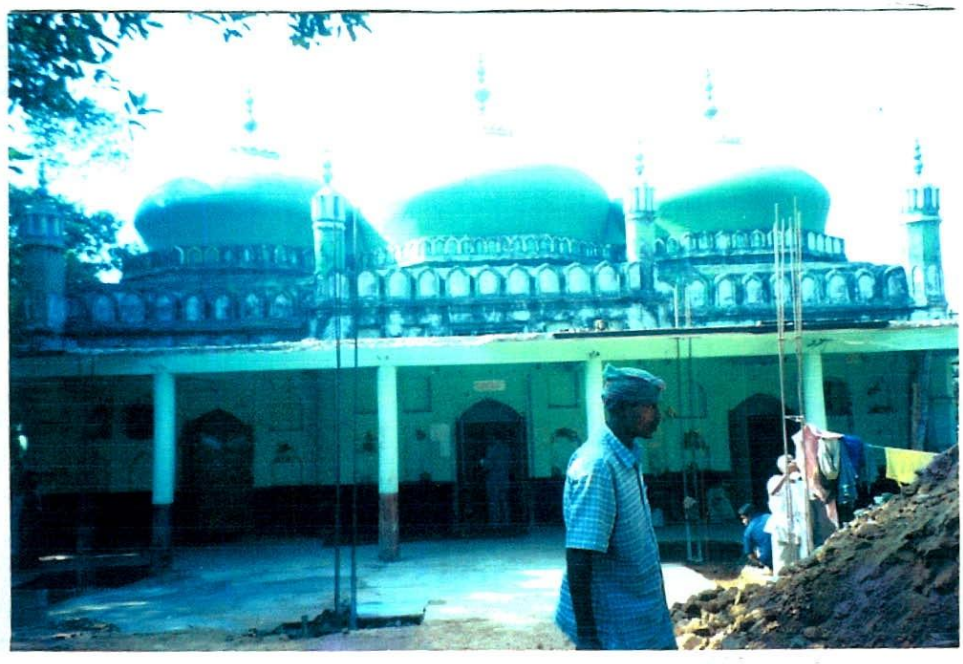

চিত্র - ২৩ : আশরাফপুর সদর গাজী মসজিদ, বর্তমান সম্মুখ দৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ২৪ : আশরাফপুর সদর গাজী মসজিদ, পিছনের দৃশ্য : বন্ধ মারলনের নকশা

Dhaka University Institutional Repository

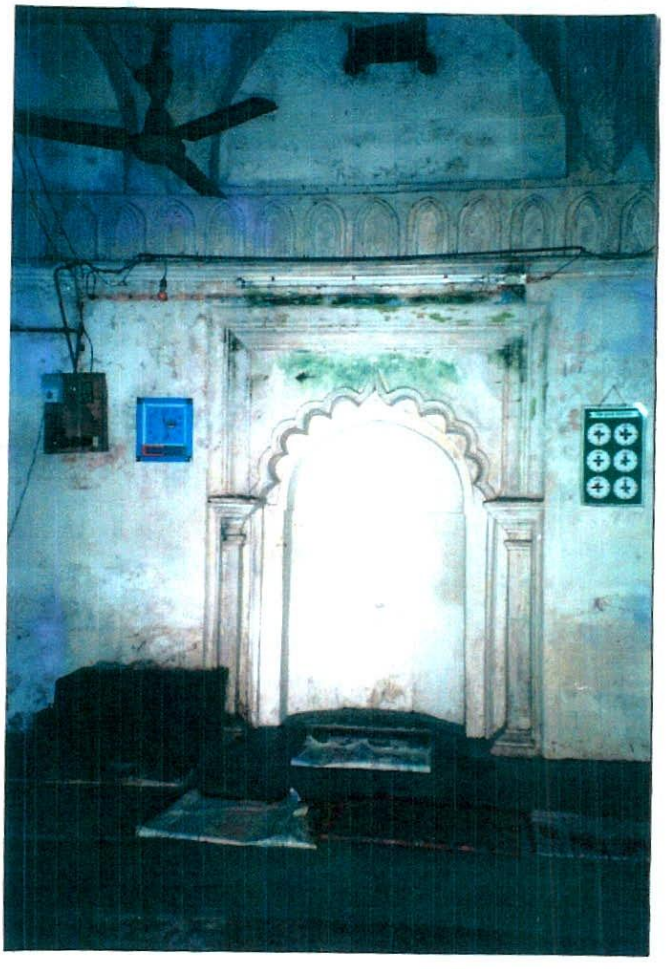

চিত্র - ২৫ : আশরাফপুর সদর গাজী মসজিদ, কেন্দ্রীয় মিহরাবের খাঁজকাটা খিলান

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ২৬ : ওয়ালিপুর মসজিদ, সম্মুখ দৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ২৭ : ওয়ালিপুর মসজিদ, অভ্যন্তরের দৃশ্য : অষ্টকোনাকার স্তম্ভ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ২৮ : ওয়ালিপুর মসজিদ, গম্বুজ নির্মাণে ব্যবহৃত স্কুইঞ্চ

Dhaka University Institutional Repository

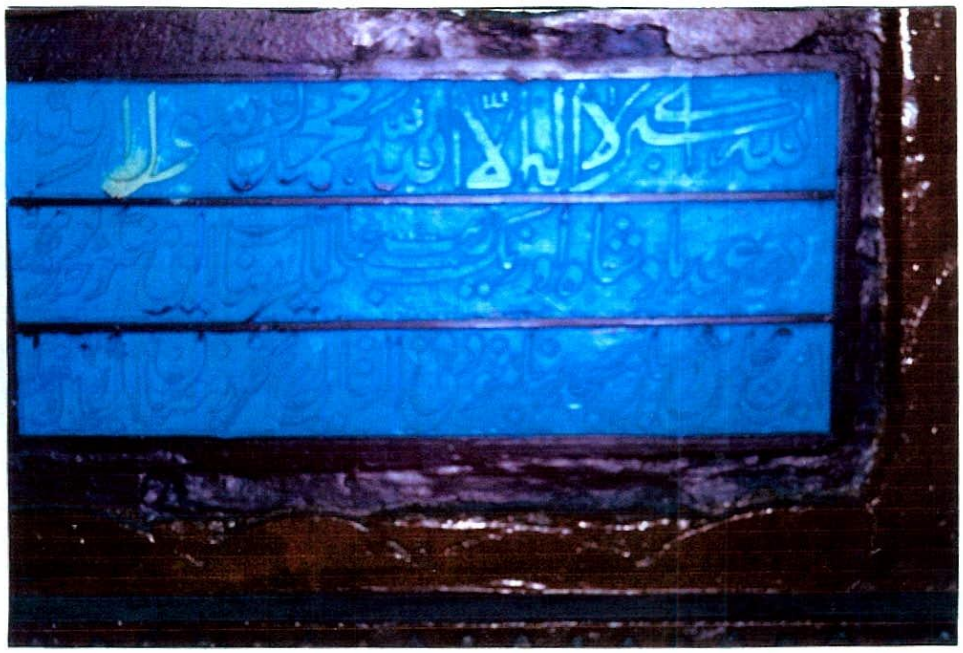

চিত্র - ২৯ : সরাইল মসজিদের শিলালিপি

Dhaka University Institutional Repository

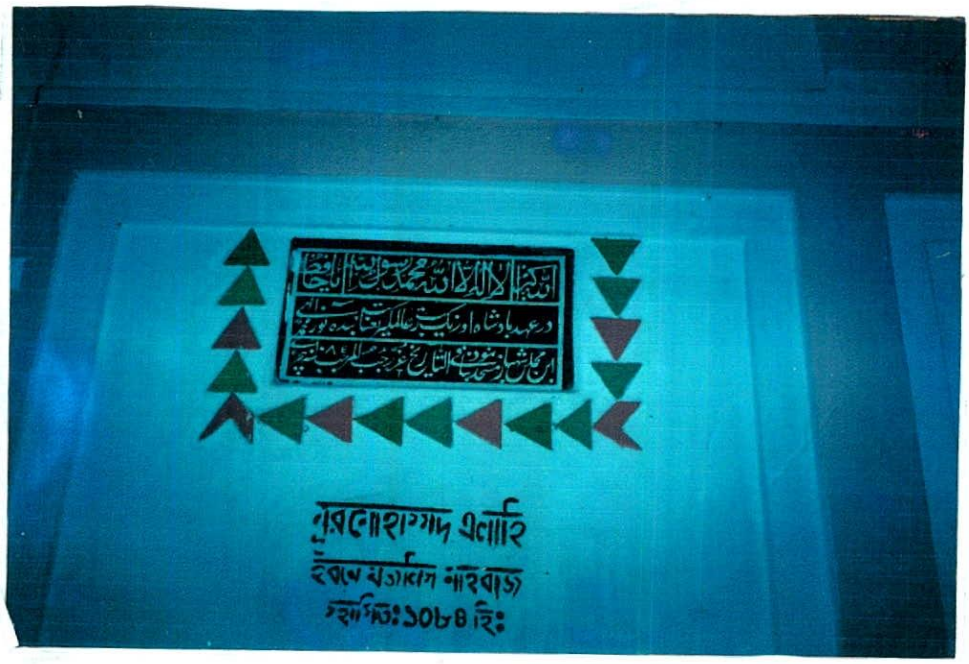

চিত্র - ৩০ : ভাদুঘর মসজিদের শিলালিপি

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ৩১ : বড় শরীফপুর মসজিদের প্রবেশপথের ওপর স্থাপিত শিলালিপি

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৩

কুমিল্লা অঞ্চলের মুঘল শিলালিপি

সরাইল মসজিদের শিলালিপি (আলোকচিত্র : ২৯)

পরিমাপ : ২২.৫ সেমি × ৫১.০ সেমি

পঙক্তি সংখ্যা : ৩ (তিন)

ভাষা : ফারসি

ফারসি পাঠ :

١. الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله

٢. در عهد بادشاه اورنگ زيب عالمگير بعنايت الهى بكوحه نور محمد

٣. ابن مجلس شهباز مسجد بنا نمود فى التاريخ ٦ رمضان المبارك سال ١٠-٤ .

উচ্চারণ:

প্রথম পঙক্তি : আলাহু আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ

দ্বিতীয় পঙক্তি : দার আহাদে বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর বেইনায়াতে নামকুহে নুর মুহাম্মদ

তৃতীয় পঙক্তি : ইবনে মজলিস শাহবাজ মসজিদে বেনা নামুদ ফি আল তারিখ ৬ রমজান আল মুবারক সাল ১০(...)৪[১]

বাংলা অনুবাদ :

প্রথম পঙক্তি : আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ

---

১. একটি অঙ্ক অস্পষ্ট, পাঠযোগ্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পঙক্তি : বাদশাহ আওরঙ্গজেবের শাসন আমলে নুর মুহাম্মদের স্ত্রীর আনুকুল্যে

তৃতীয় পঙক্তি : যিনি ছিলেন মজলিস শাহবাজের পুত্র, এই মসজিদটি পবিত্র ৬ রমজান ১০(..)৪ তারিখে নির্মিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

৭ ভাদুঘর মসজিদের শিলালিপি (আলোকচিত্র : ৩০)

পরিমাপ : ২২.৫ সেমি × ৫১.০ সেমি

পঙক্তি সংখ্যা : ৩ (তিন)

ভাষা : ফারসি

ফারসি পাঠ :

۱. الله اکبر لا اله الله محمد رسول الله یاحاق
۲. در عهد بادشاه اورنگ زیب عالمگیر بعنایت
۳. ابن مجلس شهباز مسجد بنا نمود فی التاریخ ۶ رجب
هجری ۱۰۸۴ .

উচ্চারণ:

প্রথম পঙক্তি : আলাহু আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ইয়া হক

দ্বিতীয় পঙক্তি : দার আহাদে বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর বেইনায়াতে বানদেহ নুর মুহাম্মদ ইলাহি

তৃতীয় পঙক্তি : ইবনে মজলিস শাহবাজ মসজিদে বেনা নামুদ ফি আল তারিখ ৬ রজব আল মুরাজ্জেব হিজরি ১০৮৪

বাংলা অনুবাদ :

প্রথম পঙক্তি : আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। হে সত্য

দ্বিতীয় পঙক্তি : বাদশাহ আওরঙ্গজেবের শাসন আমলে নুর মুহাম্মদ এলাহির আনুকুল্যে

তৃতীয় পঙক্তি : যিনি ছিলেন মজলিস শাহবাজের পুত্র, এই মসজিদটি ৬ রজব ১০৮৪ হিজরি তারিখে নির্মিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

বড় শরীফপুর মসজিদের শিলালিপি (কেন্দ্রীয় মিহরাবের ওপর স্থাপিত)

(আলোকচিত্র : ৩২)

পরিমাপ : ২২.৫ সেমি × ৫১.০ সেমি

পঙক্তি সংখ্যা : ৩ (তিন)

ভাষা : ফারসি

ফারসি পাঠ :

۱. یاعلی بسم الله الرحمن الرحیم یاعلی
۲. از محمد حیات والاقدر شد بنا محبدی چو حرمت حرم.
۳. سال تتم این خجسته بنا یافتم کفت مسجد اعظم.

উচ্চারণ:

প্রথম পঙক্তি : ইয়া আলী। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইয়া আলী

দ্বিতীয় পঙক্তি : আয মুহাম্মদ হায়াত ওয়ালা কাদের শুদ বেনায়ে মাসজিদি হরমাতে হারাম

তৃতীয় পঙক্তি : সালে তামির ইন খুজিসতেহ বেনা হাতে কাম গুফত 'মসজিদে আজম'

বাংলা অনুবাদ :

প্রথম পঙক্তি : হে আলী। পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আলী

দ্বিতীয় পঙক্তি : মুহম্মদ হায়াত পবিত্র এই মসজিদটি নির্মাণ করেছেন

তৃতীয় পঙক্তি : এই মঙ্গলজনক স্থাপনার মেরামতের তারিখ গায়েবি আওয়াজে বললো সবচেয়ে বড় মসজিদ (কোনগ্রামে এর তারিখ পাওয়া যায় : ১১১৮ হিজরি)

 Dhaka University Institutional Repository

বড় শরীফপুর মসজিদের শিলালিপি (কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের ওপর স্থাপিত) (আলোকচিত্র : ৩১)

পরিমাপ : ২২.৫ সেমি × ৫১.০ সেমি

পঙক্তি সংখ্যা : ৩ (তিন)

ভাষা : ফারসি

ফারসি পাঠ :

১. یا علی بسم الله الرحمن الرحیم - یا علی

২. از محمد حیات عبد کریم مسجدی شد بنا چو کعبه مقیم

৩. سال تاریخ قرحش هاتفی گفت طاهر بود زنام اعظم

উচ্চারণ:

প্রথম পঙক্তি : ইয়া আলী। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইয়া আলী

দ্বিতীয় পঙক্তি : আয মুহাম্মদ হায়াত আবদে করিম মাসজিদি শুদ বেনা চু কাবে মুকিম

তৃতীয় পঙক্তি : সালে তারিখে ফারহাশ হাতেফি গুফত যাহর বুদ যে 'নামে আজম'

বাংলা অনুবাদ :

প্রথম পঙক্তি : হে আলী। পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আলী

দ্বিতীয় পঙক্তি : আল্লাহর বান্দা মুহম্মদ হায়াত কর্তৃক কাবা সদৃশ এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে

তৃতীয় পঙক্তি : মহিমাময় চেতনা গায়েবি আওয়াজে এর নির্মাণ তারিখ প্রকাশ করলো সর্ববৃহৎ নাম হতে। (কোনগ্রামে এর তারিখ পাওয়া যায় : ১১০২ হিজরি)

Dhaka University Institutional Repository

উলচাপাড়া মসজিদের শিলালিপি

পরিমাপ : ২২.৫ সেমি × ৫১.০ সেমি

পঙক্তি সংখ্যা : ৩ (তিন)

ভাষা : ফারসি

ফারসি পাঠ :

۱. بتوفیق ایزد محمد مراد بسعی تمام این بنا را نهاد
۲. عجب مسجدی مثل قصر بهشت درفیض بر روی
بهشت درفیض بر روی ساجد گشاد
۳. چو خبری همی جست تاریخ او ندا هاتفی بیت خالق
برار ۱۱۴۳ .

উচ্চারণ:

প্রথম পঙক্তি : বে তওফিকে ইজ্জাদ মুহম্মদ মুরাদ বেসায়ে তামাম ইন বেনা র
নেহাদ

দ্বিতীয় পঙক্তি : আজাব মাসজিদি মিসলে কাসরে বেহেশত দার ফাইয়াজ বর রুয়ে
সাজদে গুশাদ

তৃতীয় পঙক্তি : চু আবদি হামি জুশত তারিখ উ নাদা হাতেফি বায়েতে খালিক
বেদাদ ১১৪৩

বাংলা অনুবাদ :

প্রথম পঙক্তি : আল্লাহর অনুগ্রহে মুহম্মদ মুরাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই ইমারতটি
নির্মিত হয়েছে

দ্বিতীয় পঙক্তি : বেহেশতের প্রাসাদতূল্য এই মসজিদটি মুঘল্লীদের উপর আল্লাহর
দয়ার দরজা উন্মুক্ত করেছে।

তৃতীয় পঙক্তি : গায়েবি আওয়াজ ইমারত নির্মাণের তারিখ দিল। ১১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৪

গ্রন্থপঞ্জি

Abul Fazl, *Ain-i-Akbari*, (Translated into English by H.S. Jarrett, Corrected and annoted by J.N. Sarkar), Calcutta, 1949, vol. I, II and III

Ahmed, Shamsuddin, *Inscriptions of Bengal,* Vol. IV, Rajshahi, 1960

Asher, Catherine, B, *Architechture of Mughal India,* Cambdidge, 1991

Bari, M.A., *Mughal Mosque Type in Bangladesh: Origin and Development*, Unpublished Ph.D thesis, IBS, Rajshahi, 1990

Beal, S., *Buddhist Records of the Eastern World,* vol. IV, Calcutta, 1959

Dani, A.H., *Muslim Architecture in Bengal,* Dacca, 1961

Eaton, R.M., *The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1760,* Oxford, 1981

Faruki, Zahiruddin, *Aurangzeb and His Times,* Delhi, 1935

Fleet, J. F., (Editor), *Corpus Incriptionum Indicarum,* vol. 2, London, 1888

Ghauri, Iftikhar Ahmad, *War of Succession between the sons of Shajahan, 1757-58,* Lahore, 1964

Hasan, Mahmudul, *Mosque Architecture in Pre-Mughal Bengal,* Dhaka, 1970

Dhaka University Institutional Repository

Hasan, Perween, *Sultanate Mosque Types of Bengal : Origin and Development*, Unpublished Ph.D thesis, Harvard University, USA, 1983

Hussain, A.B.M., (Editor), *Mainamati-Devaparvata* (Dhaka, 1997)

Karim, Abdul, *History of Bengal Mughal Period,* Rajshahi, vol. 1, 1992 and 2, 1995

Karim, Abdul, *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal, Dhaka*, 1992

Karim, K.M, *The Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan,* Dacca, 1974

Manrique, F.S., *Travels of Fray Sebastien Manrique 1629-1643,* Translated by E. Luard and H. Hosten, Oxford, 1927

Martin, M. *History, Antiquities, Topography and Stitistics of Eastern India,* vol. II. London, 1838

Mirza Nathan, *Bahristan-i-Ghaybi,* Translated into English by M. I. Borah, Guahati, 1936

Michell, George, *Islamic Heritage of Bengal,* Paris, 1984

Morisson, B.M., *Lalmai, a Cultural center of Early Bengal an Archaeologi-cal Report and Historical Analysis,* London, 1974

Mukherjee, R.K., *The Changing Face of Bengal,* Calcutta, 1938

Nath, R., *History of Sultanate Architecture*, New Delhi, 1978

Rashid, Harun-ur, *The Early History of South-East Bengal in the Light of Recent Archaeological Material,* University of Cambridge, 1968

Dhaka University Institutional Repository

RayChaudhury, Tapan Kumar, *Bengal Under Akbar and Jahangir,* Delhi, 1969

Sarkar, Jagadish Narayan, *The Life of Mir Jumla, The General of Aurangzeb,* 2nd edition, Delhi, 1979

Sarkar, Sir J.N., (Editor), *History of Bengal,* vol. 2, Dacca, 1948

Sarkar, Sir J. N., *Studies in Mughal India*, Calcutta, 1919

Stewart, Charles, *The History of Bengal,* first Indian reprint, Delhi, 1971

Webster, J.E., *Eastern Bengal District Gazetteers,* Allahabad, 1910

Dhaka University Institutional Repository

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, (সম্পাদিত), *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস,* কুমিল্লা, ১৯৮০

আ. কা. মো. জাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, ঢাকা, ১৯৮৪

আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ঢাকা, ১৯৮৭

আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস মুঘল আমল (প্রথম খণ্ড)*, রাজশাহী, ১৯৯২

কালী প্রসন্ন সেন (সম্পাদক), *শ্রী রাজমালা* (কাব্যগ্রন্থ), আগরতলা, ১৩৬৬ ত্রিপুরাব্দ

কৈলাস চন্দ্র সিংহ, *'রাজমালা' বা ত্রিপুরার ইতিহাস,* আগরতলা (দ্বিতীয় অক্ষর সংস্করণ), ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

মজুমদার, রমেশ চন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস মধ্যযুগ,* কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৫ : পরিভাষা

Arch	খিলান
Blind marlon	বন্ধ পদ্মপাঁপড়ি
Bulbous	কন্দাকৃতির
Cenotaph	শবাধার
Corner Tower	পার্শ্ববুরুজ
Cupola	ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজ
Drum	পিপা
Finial	শীর্ষ চূড়া
Grille	জালি
Kiosk	ছত্রী
Marlon	পদ্মপাঁপড়ি
Panel	খোপ
Parapet	বপ্র
Phase of transition	অবস্থান্তর পর্যায়
Rosette	গোলাপ নকশা
Squinch	স্কুইঞ্চ
Transverse Arch	আড়-খিলান
Turret	ক্ষুদ্রাকৃতির মিনার
Vault	খিলান ছাদ